পতনের বিরুদ্ধে

পতনের বিরুদ্ধে

কবিতা সিংহ

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
মাঘ, ১৩৬৪

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
লীলা ঘোষ
তাপসী প্রিন্টার্স
৬ শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

বিমল রায়চৌধুরীকে

লেখিকার আর একটি উপন্যাস

একটি খারাপ মেয়ের গল্প

পতনের বিরুদ্ধে
পতনের বিরুদ্ধে
পতনের বিরুদ্ধে
পতনের বিরুদ্ধে
পতনের বিরুদ্ধে
পতনের বিরুদ্ধে
পতনের বিরুদ্ধে
পতনের বিরুদ্ধে
পতনের বিরুদ্ধে
পতনের বিরুদ্ধে

চিহ্ন করা শিমুল গাছটাকে ঠাহর করে রবি ঠিকঠাক নেমে পড়ল। এসব দিকের বাস-রাস্তাগুলোই বেশ রোগাটে আর টালমাটাল। সুজাতাদির বাড়ি যাবার রাস্তাটা আরো হিলহিলে, আরো আঁকাবাঁকা। মোড়ের কাছে একগোছা দোকানপাট। ভাতের হোটেল, পানবিড়ি, মিষ্টি, ছিটকাপড় আর বেনেতি মশলার। রবিকে এখন এসব পেরিয়েও আরো অনেকখানি হাঁটতে হবে। কতদূর? ওই যেখানে রাস্তাটা সরু আর আবছা হতে হতে হারিয়ে গেছে বিকেলের রঙীন কুয়াশার ভেতর। ছোট্ট একটা নিশ্বাস চাপল রবি।

খানিকদূর গেলেই তুপাশে তুচারটে কাঁচাপাকা কম পুরোনো বাড়ি আর কয়েকটা নড়বড়ে বস্তি। তারপর নিচু একটা ফুটবল খেলার মাঠ। সেখানকার এক হাঁটু লেবুপাতা রঙের আলোর ঢল ভেঙে উঠে আসছিল একদল ছেলে। হাতে তাদের লুফতেথাকা একটা ফুটবল। পাশেই ভাঙা ঘাটলার ধারে পানাপুকুরের ওপর ঝুঁকে-পড়া নিমগাছটার ছায়ায় বসে জটলা করছে কয়েকটি মেয়ে। তাদের শাড়িগুলো নানান রঙের ফোঁটা হয়ে জ্বলছিল। রবির আশে-পাশে চলেছে ছাড়া ছাড়া ভাবে তু-চারজন ঘরে ফেরা মানুষ। যারা কলকাতা থেকে কিংবা এখানকারই কোনো কাজের পাড়া থেকে আসছে। ফিরছিলও কিছু মানুষ। জনমজুর শ্রেণীর। মাঝে মাঝে সাইকেল রিক্শোর প্যাঁক্ প্যাঁক্। কানে তালা লাগিয়ে দেয়া আর একটু এগোলোই গুদামঘর। কয়েকটা

আলকাতরা মাখানো দোতলা টিনের শেড্। কোনোটার সামনে টাল করা পিপে, কিংবা মরচে-পড়া বাতিল লোহালক্কড়। টারপুলিনের গন্ধ ভেঙে, কচুবন থেকে উঠে এসেছে জলে-ভেজা সোঁদা মাটি আর কাঁচা পাতার গন্ধ। এখানেও রবির একটা নিশানা আছে। কবেকার, একটা মাটিতে বসে-যাওয়া ভাঙা ট্যাক্সির ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে বেঁকে যাওয়া, আরো সরু পথটার দুপাশে এবার ক্রমাগতই পুরোনো নড়বড়ে বাড়ি। মাঝে মাঝে লতাপাতা আর আগাছায় প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়া স্তূপাকার পোড়ো ভিটে। সবুজ পাতালতার তলা দিয়ে উঁকি মারতে থাকা মেটে সিঁদুর রঙের লোনা-ধরা পাতলা পাতলা ইটগুলোকে বিকেলের রাঙা আলোয় ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। এখানেই কাঁচা ড্রেনের পাশে সুজাতাদির আস্তানা। বাড়িটাকে প্রথমেই পরিত্যক্ত মনে হতে পারে। সামনের কয়েকটা ঘর ছাদহীন, ধসা দেয়াল পড়ে আছে। এসব একটু পেরিয়ে গেলেই ভেতরে পেটা ঝামার উঠোন। উঠোনের চারপাশে চক্-মেলানো তিনতলা বাড়ির কেবল নিচের তলার খুপরিগুলোই কোনো-মতে বাসযোগ্য আছে। দোতলা তেতলা প্রায় নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে তাতে বাস করা যায় না। একটি দিকের দোতলার সামান্য অবশিষ্ট দেওয়ালের সঙ্গে কাঠ, টিন আর ক্যানভাস্ জুড়ে-তেড়ে বাড়ির আপাতত মালিক নামে পরিচিত লোকটি একটা আস্তানা তৈরী করে নিয়েছে। উঠোনে রাখা সদ্য ধরানো উনোন ঘুঁটে-কয়লা, এঁটো বাসনের ডাঁই, পায়রার খোপ, তুলসীর টব, দড়ির দোল্‌নায় শিশু, জটলা পাকানো মেয়েপুরুষ পেরিয়ে সুজাতাদির ঘরের সামনে এসে রবি একটু আশ্চর্য হ'ল। আজ বুধবার। আজ তো সুজাতাদির হাসপাতালে ডিউটি থাকে না। তা ছাড়া সুজাতাদি জানে বুধবার রবি আসে। তাহলে দরজা বন্ধ কেন? রবি এগিয়ে গেল। না, তালা দেওয়া নয়। দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ। কিন্তু সুজাতাদি তো এমন সময়ে দরজা বন্ধ করে

থাকে না। ঝামা-পেটা দালানে চারপাই-এর ওপর বসে কাচের গেলাসে চা খায় আর বাড়ির সকলের সঙ্গে গল্প করে। তবে কি সুজাতাদির শরীর খারাপ হ'ল? রবির গা কেঁপে উঠল। সে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে কড়া নাড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। যেন দরজার ওপাশে কেউ দরজা খোলার জন্য অপেক্ষায় ছিল। আর তার ছায়ামূর্তি দেখে হাতের উল্টো পিঠটা নিজের হাঁ হয়ে আসা মুখে চাপা দিয়ে একটা আর্তস্বরকে গলার মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে হু'পা পেছিয়ে গেল কেউ। রবি শুনতে পেল অস্ফুট স্বরে মেয়েলী গলায় কেউ বলছে—'ওরা আবার আসছে। না, না—। আমি কিছুতেই যাব না।'

রবি বুঝতে পারল ঘরের ভেতর যে আছে সে সুজাতাদি নয়। সুজাতাদির অমন ফ্যাস্‌ফ্যাসে গলাই নয়। আবছা আর ভাঙা কণ্ঠস্বর। ভরাট ঘণ্টাধ্বনির মত একটু ধাতব গলা সুজাতাদির। আত্মবিশ্বাসী! সুনিশ্চিত। তা ছাড়া সুজাতাদি আরো লম্বা। আরো উঁচু।

রবি সেই আধো-অন্ধকারে ঝাপ্‌সা মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বলল,

—আমি রবি। সুজাতাদির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তিনি কোথায় গেছেন?

ঘরের ভিতরের মানুষটি এবার একটু সুস্থ হয়ে হাতড়ে হাতড়ে আলোর স্যুইচটা জ্বালাবার চেষ্টা করতে লাগল। দূরের একটা দোকান থেকে বিদ্যুতের তার টেনে এনে সুজাতাদি তার ঘরটায় ইলেকট্রিক এনেছে। রবি সবই ভালোমত জানত। তাই, সে মেয়েটির আগেই হদিশ করে টিপে দিল স্যুইচ্‌টা। কড়িকাঠের বাঁকানো হুক্ থেকে তারে ঝোলানো আলোর নেড়া বাল্ব্‌টা দপ্ করে জ্বলে উঠতেই রবি দেখল সতেরো-আঠারো বছরের একটি মেয়ে, দুটি হাত বুকের ওপর চিকের মত করে রেখে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুকেতে তার ঢেঁকির পাড়, তা তার গলার শিরার দপ্‌দপানি

দেখলেই বোঝা যায়। নিশ্চয়ই মেয়েটি একটু আগেই স্তূপাকার হয়ে শুয়েছিল। তার মাথার চুল এলোমেলো। মুখ ফোলা ফোলা। সারা মুখে বাদ্‌লার গুঁড়োর মত চিক্‌চিকে ঘাম। সেও কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে রবিকে দেখছিল।

—ফুলমাসি হাসপাতালে গেছে। সেই সক্কালবেলা। গঙ্গাদা এসে খবর দিল, এখনি আসবে।

রবি একটা কাঠের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। মেয়েটি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। সুজাতাদির ঘরের পুরোনো আমলের খাটের ছত্‌রির জোড়া-সাপ ডাণ্ডাটা ধরে। মিনিট পাঁচেক ওভাবে মুখো-মুখি চুপচাপ থাকার পর রবির রীতিমত অস্বস্তি হতে লাগল।

চৈত্রের শেষ। একটা চাপা গরম ভাপ উঠ্‌ছে ঘরের লোনাধরা দেওয়াল থেকে। পুরোনো আসবাব পুরোনো বিছানাকাঁথার গন্ধ। বাইরে থেকে ভেসে আসছে নানা খুপরির নানানতর সংসারযাপনের আওয়াজ। রবি মেয়েটির দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে হঠাৎ বলে ফেলল,—'আপনাকে তো আগে কখনো দেখিনি। সুজাতাদি বুঝি আপনার মাসি হয়?'

রবির কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল মেয়েটি। রবি দেখল তার এক পায়ের পাতা অসহিষ্ণু চাপ দিচ্ছে আর এক পায়ের পাতার উপর। বাঁ হাতের আঙুল পাক খাচ্ছে ডান হাতের আঙুলের সঙ্গে। হঠাৎ আচম্‌কা, যেন আলোর বাল্বটাকেই উদ্দেশ্য করে সে বলল, আমার নাম আলো। উনি আমার কেউ হন না। আমার মায়ের ছোটবেলার বকুল-ফুল। তাই কদিন হ'ল ফুলমাসি বলে ডাকছি।

রবি আবার পাল্‌টা প্রশ্ন করল, কদিন হ'ল?

—আজ নিয়ে পাঁচদিন।

—আপনি পাঁচদিন হ'ল এখানে এসেছেন? আগে কোথায় ছিলেন?

—বিরামপুর, চব্বিশ পরগনা।

—কবে যাবেন আবার ?

—আর তো ফিরে যাওয়া হবে না।

মাথাটা বুকের ওপর কেমন অদ্ভুতভাবে ঝুঁকিয়ে দিল আলো। আর তো ফিরে যাওয়া হবে না।

রবি এবার ভালো করে তাকালো আলোর দিকে। আলোকে সে একবার আগাপাস্তলা পরীক্ষা করে নিতে চায়। একটু ঘন নিবিড় জোড়া ভ্রূ। চোখ দুটি বড় করে চাইলেও মনে হয় স্নিগ্ধ। আধবোজা। কপালের ওপরটা হরতনের মত। নামানো ভাঁজে চুলের একটা অদ্ভুত ঘূর্ণি। এমন সেকেলে ধরনের সৌন্দর্য আজকাল আর চলে না। পেতলের বাসনের মত। তুলে রাখার। পদ্ম পাতার উল্টোদিকের মত শ্যামলা রঙ্। চিবুকে একটা টোল আর ঠোঁটের ওপরে তিল।

'আর তো ফিরে যাওয়া হবে না।' আলোর শেষ কথাটি আবার রিন্‌রিন্ করে উঠল রবির ভিতর ভিতর। 'আর তো ফিরে যাওয়া হবে না।' যেন রবিই মনে মনে বলছে। আলোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রবি। কখনো দেখলো তার ঠোঁটের উপরের কালো তিলটি কখনো চিবুকের টোল আর ভিতরে ভিতরে রিন্‌রিন্ করতে লাগল তার আলোর ওই একটি কথা, 'আর তো ফিরে যাওয়া যাবে না।' অথচ রবি তো আর আলোর ধাক্কা ওপর খেয়ে অবধারিতই ফিরে যাচ্ছে চিনুর দিকে।

নাঃ, চিনুর কোনোখানটাই আলোর মত নয়। অন্যরকম আলাদা। সূঁচ বেঁধানো। এখনো রবির ভিতরে বিঁধে আছে চিনু। রবি তেমন দেখতে পাচ্ছে না হয়ত, তবু কোথাও আছে। সেই যে জিপসিরা কাঠের পাটার গায়ে সুন্দরী মেয়েদের দাঁড় করিয়ে একরকম ছোরার টিপের খেলা দেখায় না ? একটা মেয়েকে হাসি-হাসি মুখে দাঁড় করিয়ে তার চারপাশে ছোরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে। রবিও

সেইরকম। মনে পড়ে হাসপাতালে জ্ঞান হবার পরে স্মৃতির পটে চিনুকে হেলান দিয়ে রেখে তার আনাড়ী হাতে এলোপাতাড়ি ছোরার পর ছোরা ছুঁড়ে দিয়েছে চিনুর ওপর। তার বুকে মুখে চতুর্দিকে লেগেছে ছোরাগুলো! বিঁধে ঢুকে গেছে। তবু চিনুর মুখের সেই পেটেণ্ট ব্যঙ্গের হাসিটা কখনোই মরেনি। রক্তও ঝরেনি। এতখানি ভাববার পর রবি দেখল এখন আর আলোর কথাগুলো রিন্‌রিন্‌ করছে না তার মাথার ভিতরে। কিংবা হয়ত ও কথাগুলোও সেই গভীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল যেখানে চিনু সাঁটা আছে অজস্র ছোরার পিনে বিঁধে।

রবি তাকিয়ে দেখল তার হাতের চামড়ার ওপর বিজ্‌বিজ্‌ করে ঘামের ফোঁটা উঠে দাঁড়াচ্ছে। ঝট্‌ করে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'নাঃ. আমি চলি, সুজাতাদিকে বলবেন, কলকাতা থেকে রবি এসেছিল!'

তখনই উঠোনের মুখ থেকে একটা শোরগোল উঠল। ধর্‌ ধর্‌, সামলে, ও মশাই, আপনারা কেউ একটু আলোটা দেখান না। এবং একটি জড়িত কণ্ঠের দুচারটি স্খলিত কলি। সামনের দিকের খুপ্‌রি থেকে হারিকেন নিয়ে ছুটে গেল দুটি হাফপ্যাণ্ট্‌-পরা বাচ্চা ছেলে।

রবিও নেমে গেল। নিশ্চয়ই কিশোরীবাবু। রবির পাশা-পাশি আলোও নেমে গেল। দুজনে মিলে পড়ন্ত কিশোরীবাবুকে সামলে ঘরের দিকে নিয়ে যেতে রাস্তার ছেলে-ছোক্‌রারা চলে গেল। রবি সাইকেল রিক্‌শোর ভাড়াটাও কোনোরকমে একহাতে পকেট হাত্‌ড়ে মিটিয়ে দিল। কিশোরীবাবু মুখের নানারকম বিকৃতি করছিলেন। কিংবা মুখের পেশির অদ্ভুত খিঁচুনির ওপর তাঁর কোনোরকম হাতই ছিল না হয়ত। চোখ ঘুরিয়ে অপাঙ্গে রবিকে আর আলোকে একবার দেখে নিয়ে তিনি বললেন, 'আরে! কে, ও? রবি? আর কে, ও?—ছবি? তা বেশ বেশ, টাঙিয়ে দাও বাবা। ঘরে টাঙাও!'

মুক্তকচ্ছ, জলকাদা-মাখা, ঘামে ক্লেদে নেয়ে যাচ্ছে কিশোরী-

বাবুর শরীর। চুলে ধুলো। এক পায়ে নাগরা জুতো, এক পা খালি। এ দৃশ্য এ বাড়িতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে বলে ছেলে দুটি অম্লানবদনে আলো দেখিয়ে কিশোরীবাবুকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিল। দরজা খুলে খানিকক্ষণ দাঁড়ালও,—যাতে আলো আর রবি কিশোরীবাবুকে তক্তা-পোশের ওপর শুইয়ে দিতে পারে। আলো একটা মোমবাতি জ্বেলে ঘরের টেবিলে বসিয়ে দিয়ে কিশোরীবাবুর দিকে তাকালো। আর কিশোরীবাবু। তিনি তখন এক পায়ে নাগরা, এক পা খালি, ছত্রখান হয়ে শুয়ে হাঁ করে ঘুমোচ্ছেন। আলো বেরিয়ে গিয়ে একটা লণ্ঠন জ্বেলে অন্ধকার উঠোনে নেমে গেল।

রবি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আরে, কোথায় যাচ্ছেন ?'

আলো চেঁচিয়েই উত্তর দিল, 'নাগরাটা খুঁজে আনি, না হ'লে ফুলমাসি আবার খুঁজতে বেরোবেন।'

বাতির দপ্‌দপে আলোয় রবি কিশোরীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল। কিশোরীবাবুর মুখটা ঘুমের মধ্যে আবার ক্রমশ কিশোরীবাবুর মতই স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এমনিতে ভারি সুপুরুষ চেহারা কিশোরীবাবুর। একেবারে থিয়েটারের হিরোর মত। গোবিন্দলাল সাজলে বেশ মানিয়ে যাবে। কিংবা জীবানন্দ। বছরখানেক আগে একবার নিজের ছআনার শরিকানীর দাবি নিয়ে বাড়ির মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে দারুণ চেঁচামেচি শুরু করেছিল কিশোরীবাবু। সঙ্গে পাড়ার কিছু মাতব্বর ব্যক্তি আর চ্যাংড়া ছোকরা। বুড়ি হরসুন্দরীর নাকি সাক্ষাৎ মেয়ের ঘরে নাতি। ভয়ে ওপর থেকে নেমে এসে বাড়ির কেয়ারটেকার জাতীয় লোকটি মৃত হরসুন্দরীর ঘরটা কিশোরীবাবুকে খুলে দেয়। ব্যাস, সেই থেকেই এই রকম চলেছে। কিশোরী মিত্তির এখন সুজাতাদিরই গলগ্রহ। আব্‌ছা অন্ধকারটা ক্রমশ সয়ে সয়ে আসতে ঘরটা রবির চোখের সামনে একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বেশ বড় ঘর। আসবাব-পত্রের গুদামই বলা যায়। ধুলো-পড়া আল্‌না। ঠাকুরের সিংহাসন,

কাঠের সিন্দুক, ধুলো রঙের ম্রিয়মাণ নথিপত্র, পাঁজি, ছেঁড়াখোঁড়া বই-এ ভরা আলমারি। রবি উঠে দাঁড়ালো। একধারে কিশোরী মিত্তিরের পোর্টম্যান্ট। তারই পাশে তের্ছা করে রাখা একটা কালো মলাটের ডায়েরী। ধুলো-মাখা পুরোনো। রবি খুলে দেখলো। বাংলা ইংরিজি মিশিয়ে খুদে খুদে লেখা। মলাটের ভিতরের পাতায় লেখা 'ডিয়ার শান্নুকে—কিশোরী', পয়লা জানুয়ারী ১৯৪৮। সন্ধ্যা। দিল্লী। পাতা উল্টে দেখলো যাঁর লেখা সারা ডায়েরীময় তাঁরই হাতে লেখা নাম, ধাম, পরিচয়। 'আনন্দ সরকার তিন নম্বর মদন নস্কর লেন, হাওড়া।' ডায়েরীটা টুক্ করে পকেটে ফেলে দিল রবি। বাড়ি গিড়ে পড়ে আবার কিশোরীবাবুর অজ্ঞান্তেই ফিরিয়ে দেবে। কারণ পাতা উল্টোতে উল্টোতে রবি কয়েকটা আশ্চর্য কথা দেখতে পেয়ে গেছে।

বাইরে পায়ের শব্দ। সুজাতাদি কথা বলছে। আলো তার পাশে পাশে। আলোর এক হাতে লণ্ঠন। আর একহাতে কিশোরী-বাবুর নাগরা। রবিও ঘর থেকে বেরিয়ে দালানে দাঁড়াল। বাড়ির বাসিন্দারাও সুজাতাদির গলা শুনে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। একজন উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করল,

—বাচ্চাটা বেঁচে আছে তো ?

—আছে এখনো।

—আহা ভগবান করুন, যেন বেঁচে যায়।

সুজাতাদি রবিকে ডেকে বলল, 'কিরে, রবি এসেছিস ! আয় এ ঘরে আয়।'

চটি খুলে ঘরের ভিতরে ঢুকলো সুজাতাদি। রবিও ঢুকলো। আলো লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকেই সুজাতাদি বিছানাপত্র, এটা সেটা তুলে পেতে সরিয়ে থিতিয়ে ঘরটাকে একটা মোটামুটি ভদ্র চেহারা দিতে চেষ্টা করল। তারপর আলোকে লক্ষ্য করে নিরুত্তাপ গলায় বলল,—'কি করছিলি আলো

সারাটা দিন ? সেই এক ভাব। শুয়েছিলি তো ? এভাবে কদিন থাকবি এ্যাঁ ! একটু নড়াচড়া কর। যা স্টোভ্‌টা জ্বালিয়ে একটু চা কর···হ্যাঁরে ভাত খেয়েছিলি তো ? আমি বনমালীর বৌকে যে বলে গিয়েছিলাম তোকে ভাত দিতে···কি ? চুপ করে রইলি যে ? ···খাস্‌নি তার মানে ?···'

আলো হঠাৎ নিচু হয়ে স্টোভ্‌ জ্বালাতে বসে গেল।

সুজাতাদি আর আলোকে ঘাঁটাল না। একটা টিনের চেয়ারে বসে কাঁটা খুলে খোঁপা ভেঙে আঙুল দিয়ে বিনুনিটাকে আলগা করতে লাগল।

সুজাতাদি প্রায় রবির ছোট মাসিরই বয়সী। সেই সুবাদে রবি ইচ্ছে করলে আলোর মত সুজাতাদিকে ফুলমাসি বলে ডাকতেও পারে। নেহাত একবার দিদি বলে ফেলেছে তাই। ওই ডাকটাই চলে আসছে। সুজাতাদি সুন্দর নয়। কিন্তু রবির তাতে কিছু আসে যায় না। হাসপাতালে থেকে থেকে, ভুগে ভুগে রবি ক্রমশ ঠাহর করতে পারছে যে কতকগুলো মুখ আছে যারা কোনোদিন সুন্দর হয় না, কুৎসিত হয় না, বয়সে নষ্ট হয় না, আঘাতে ভেঙে পড়ে না। সুজাতাদির মুখ সেই সব মুখের একটি। এই রকম কয়েকটা মুখ রবির জীবনে কেমন মিশিয়ে হারিয়ে গিয়েছে বলেই রবি মাঝে মাঝে পায়ে বল পায় না, কেমন বসে পড়ে। রবির ভাবতে কষ্ট হয়, তার মায়ের মুখেও এমনি একটা নকল মুখের মুখোশ ছিল। মায়ের মুখখানা মনের ভিতরে জোর করে ডুবিয়ে দিয়ে রবি সুজাতাদির দিকেই তাকাল।

সেই একই মুখ। হাসপাতালে যেমনটি প্রথম দেখেছিল। আব্‌ছা। নাকে মুখে নল লাগানো অবস্থায় সারা গায়ে ছেঁড়া কাটা, আর গলায় গভীর একটা আঘাত নিয়ে যখন তার প্রথম জ্ঞান হ'ল। সুজাতাদির চোখ দুটো একটু বসা। নাকের পাতায় নাকছাবির ফুটো। কথা বললে নাকের লতিটি ফুলে ফুলে ওঠে। খস্‌খসে

কালো রঙ। নার্সের হুডের তলা দিয়ে উপ্‌চে নামা কটি চূর্ণ চুল। ভুরু দুটো দুশ্চিন্তায়, মন খারাপে একটু যেন কুঁক্‌ড়ে আছে। স্পিরিট ভেজানো তুলো দিয়ে মুখের শুক্‌নো জমাট রক্তের দলাগুলি রগ্‌ড়ে তুলে দিচ্ছিল। দীর্ঘ সবল হাত। চুড়ি বালাহীন, নেড়া। কিন্তু সেবায় অক্লান্ত। আজও তেমনি মন খারাপে কোঁকড়া ভ্রূ। অন্যমনা দেখাচ্ছে সুজাতাদিকে।

—কি ভাবছ সুজাতাদি ?

—বাচ্চাটার কথা রে। এখনো ভয় কাটেনি।

স্টোভে পাম্প করতে করতে আলো বললে, 'তবে যে বললে, বেঁচে যাবে।'

—যেতে পারে, তবে এখনো অক্সিজেন চলছে কি না !

—কাদের বাচ্চা সুজাতাদি ?

রবির দিকে তাকিয়ে চুলে আঙুল চালাতে চালাতে সুজাতাদি বলল,

—ওই আর কি, কারা মোড়ের কাছের ডাস্টবিনে একটা বাচ্চা ফেলে গিয়েছিল মুখে নুন তুলো দিয়ে···মরেই যেত···মাথার ওপর শকুন ঘুরছিল। সবাই দেখছিল কেউ সাহস করে তোলেনি।···তা, হালদারদের বাড়ির বৌটা···সে তুই দেখিসনি···ফ্যাকাশে আর ভীতু মত···চব্বিশ ঘণ্টা স্বামী আর শাশুড়ীর গঞ্জনা খায়···বাবা তার মধ্যেও অত ছিল···সোজা রিকশা চড়ে বাচ্চাটাকে তুলে আমার কাছে এনে হাজির···। বাচ্চাটাকে ফার্স্ট এড্‌ দিয়ে নিয়ে গেলাম ট্যাক্সি করে হাসপাতালে···কি লাঙসের জোর বাবা···দেখি ঠিক ধুক্‌পুক্‌ করছে।

চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে আলো বলল,

—ওরা বলাবলি করছিল বৌটাকে খুব বকাবকি করেছে ওর বর। তারপর কালীঘাটে নিয়ে গেছে প্রায়শ্চিত্তির করাতে।

রবি প্রশ্ন করল, বাচ্চাটা ছেলে না মেয়ে ?

—মেয়ে।

আলো হাঁটু গেড়ে বসে হঠাৎ গলা তুলে বলল, তাহলে ওটাকে বাঁচালে কেন?

আলোর ফ্যাঁসফ্যাঁসে ভাঙা গলাও যে অমন রিন্‌রিন্‌ করে উঠতে পারে তা কে জানত?

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হেসে কি যেন বলতে যাচ্ছিল সুজাতাদি। হঠাৎ কিশোরীবাবুর ঘরে একটা কিসের শব্দ হ'ল যেন। সুজাতাদি তাড়াতাড়ি পাশের টেবিলে চায়ের পেয়ালা রেখে উঠতে যাচ্ছিল। আলো বলল,

তুমি খেটেখুটে এসেছ, গল্প করো। ধুয়ে-মুছে সাফ্‌সুতরো করা তো? ও আমি করে দিচ্ছি দেখো।

দড়ি থেকে একটা জীর্ণ তোয়ালে টেনে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল আলো।

—মেয়েটি কে সুজাতাদি?

—আমার চেনা একটা ফ্যামিলিব মেয়ে। বারাসাতের কাছে বাড়ি।

—তা হঠাৎ তোমার কাছে কেন?

—ওর মা রেখে গেছে আমার কাছে। কদিন থেকে চলে যাবে আর কি!

—কিন্তু ও যে বলছিল, 'আর তো ফিরে যাওয়া যাবে না।'

—বলছিল বুঝি!

সুজাতাদি গলা নিচু করে রবিকে বলল, 'স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় কতকগুলো বাজে ছেলে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওকে। তারপর রেল-লাইনের ধারে ফেলে দিয়ে যায়···ওই যেমন সব অ্যাক্‌সিডেণ্ট্‌ হয় আর কি···ভাগ্যে থাকলে।···তোর যেমন আলটপ্‌কা হয়েছিল··· কৈ দেখিরে তোর গলার দাগটা।

রবি গলাটা একটু এগিয়ে নিয়ে এল সুজাতাদির কাছে। সুজাতাদি আঙুলের ডগা দিয়ে পরম মমতায় ওর গলার শুকিয়ে

যাওয়া ক্ষতের সেলাইটি ছুঁল। এক বছর ধরে তুবার প্লাস্টিক সার্জারি করে করে তবু বড় ক্ষত আর গর্তটা একটা ভদ্রগোছের পুঁটলি পাকানো চেহারা নিয়েছে। প্রথম যখন আয়নায় ক্ষতটা দেখে রবি তখন তো অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল আর কি! স্কন্ধকাটার মত একটা মস্ত হাঁ করা ক্ষত। বোমাটা সোজা রবির মাথা লক্ষ্য করেই ছুঁড়েছিল ওরা। মারা গেল পাশে দাঁড়ানো অলক। একটা স্পি.ণ্টার সিধে ঢুকে গিয়েছিল তার হার্টে।

খেতে খেতে রবি বলল, তোমার কলিক পেন্‌টা কেমন আছে সুজাতাদি?

—এখন ভালো আছেরে।…

রবি বুঝতে পারল সুজাতাদি আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। কিশোরীবাবু বিড়বিড় করে কি সব বক্‌ছেন। আর আলো চাপা গলায় তাঁকে সমানে ধমক দিচ্ছে।

—দেখছিস্, হাতে কাজ পেলে মানুষ কেমন ভুলে যায়। আলোটাকে দেখ্ একবার।

—তুমি এত লোককে সারিয়ে দিলে সুজাতাদি। কিশোরীবাবুকে সারাতে পারলে না?

—বোকারাম। অসুখ কি মানুষের শরীরেই থাকে রে? সুজাতাদি হাসল। সুজাতাদির দাঁতগুলি ঝক্‌ঝকে আর শাদা। শ্ব-দন্তগুলি একটু বাঁকা বলে ওর শ্রীহীন মুখটাও হাসলে আলোময় হয়ে যায়। তোর কথাই ধর না। তোর কি শুধু গলায় স্প্লি্‌ন্টার লেগেছিল? সত্যি করে বল? তুই কি বাঁচতে চেয়েছিলি রবি?

সুজাতাদি যেন রবির ভিতরের কোনো আদত জায়গায় কোনো 'তার' জাতীয় জিনিসে টং করে একটা চিন্তা বাজিয়ে গেল। তার গলার কাছের শুকনো ক্ষতটায় একটা এক পলকের খিঁচ ধরে সারা গাটা একবার যেন ঝাঁকি দিয়ে উঠল।

একটা বড় নিশ্বাস ফেলে সুজাতাদি আবার বলল, কিশোরী-

বাবুর জন্য এই এক বছরে যা করা হয়েছিল, তাতে তাঁর সেরে না ওঠবার কথা নয়। এটাই দুঃখের।

বাইরে ঝনাৎ করে একটা বালতি রাখার শব্দ হ'ল। আলো দরজা ধরে যেন কিছু বলবে বলে দাঁড়িয়েছে।

—হোটেল থেকে ভাত আসবে? না বাড়িতে রান্না?

—দুটো ভাতে ভাত চাপিয়ে দেনা আলো! মসুর ডাল আর আলু দিয়ে···জানিস রবি, আলো কাল আমাদের বেশ ঝোল-ভাত রেঁধে খাইয়েছিল। ও বেশ ভালো রাঁধে।

আলো তবু দরজা ধরে দাঁড়িয়েই রইল। নড়ল না।

—কিরে? কি হ'ল? স্টোভটা ধরা—

হঠাৎ অদ্ভুত সুরে আলো যেন ঘোষণা করে উঠলো, 'এখন আমি চান করব। আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

সুজাতাদি আর রবি অবাক হয়ে ঘুরে তাকাতেই আলো যেন একটু ভয় পেয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে দাঁড়াল। সুজাতাদি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বাক্স খুলে আলোকে একটা ইস্ত্রি করা শাড়ি, ধোয়া সায়া ব্লাউজ আর সাবানদানিটা এগিয়ে দিয়ে কোমল গলায় বলল,

—এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। মা আমার। যা ঘরটায় চাবি দিয়ে চান করে নে। আমি রবিকে নিয়ে বেরোচ্ছি। ওকে বাসে তুলে দিয়ে আসব আর মোড়ের ভাতের হোটেল থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে করে খাবার নিয়ে আসব।

দরজার ওপরের তাক থেকে চারডালার টিফিন ক্যারিয়ারটা পেড়ে নিয়ে রবি সুজাতাদির পাশে পাশে হেঁটে চলল।

রাস্তায় পাত্‌লা জ্যোৎস্না পড়েছে। পোড়ো বাড়ির আগাছার মধ্যে থেকে জোরালো ঝিঁঝির শব্দ। সুজাতাদি বলল, তুই কি এখনো নতুন কলোনীতে ছোট মাসির কাছেই রয়েছিস?

—হ্যাঁ।

—পুরোনো পাড়ায় ফিরে যাবিনে?

বিস্বাদ গলায় রবি বলল, ওপাড়ায় আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না সুজাতাদি।

—নিজের মা-বাবা ভাইবোনদের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?

—নাঃ।

—মা বাবার মনে কত লাগে বল?

—লাগে নাকি? হয়ত লাগে।

—হয়ত লাগে? তুই কি বল্‌ছিস রবি? নিশ্চয়ই লাগে। সত্যি আমি তোদের রকম-সকম ঠিক বুঝতে পারি না রে রবি।

সুজাতাদি রবির দিকে না তাকিয়ে সোজা রাস্তার দিকে চেয়ে হাঁটছিল। চাঁদের পাত্‌লা আলোয় পাশ থেকে সুজাতাদির চোয়াল আর চিবুকে কেমন একমেটে ঠাকুরের একটা ডৌল এসে গেছে। রবির সমীহ হ'ল। কেমন ভয় ভয় করতে লাগল দেখে। সে বুঝতে পারল সুজাতাদি তার কথায় বেশ কষ্ট পাচ্ছে। তার সম্বন্ধে যেমনটা মনে মনে ভাবে, তেমনটা আর ভাবতে পারছে না। রবি তাই তাড়াতাড়ি বলল, 'ছোটমাসি বলে এখনো আমি দুর্বল আছি। বলে এত তাড়াতাড়ি বরানগরে ফিরে যাওয়াটাও ভালো নয়। কার মনে কি আছে কে জানে? ছোটমাসি বলে আর কিছুদিন বাদে মেসোর ওখানে চাকরি-বাকরিরও একটা ব্যবস্থা হতে পারে।'

ভাতের হোটেলটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সুজাতাদি বলল, 'রবি তুই আমার আসল কথাটাই ধরতে পারিস নি। আমি ও সব দিকেই যাচ্ছি না রে। চাকরি-বাকরি, দায়িত্ব, ও সব মোটা কথা থাক্‌। তুই শুধু আমাকে এইটুকু বল্‌, হাসপাতালে তোর সঙ্গে আমার এক বছরের চেনা। আমার খোঁজখবর করতে তুই নিয়ম করে আসিস। অথচ তোর মা-বাবা, ভাইবোনেদের কথা তুই কবার বলেছিস আমার কাছে বল। আমার টিফিন কৌটোটা তুই হাতে

করে বয়ে নিয়ে এলি, সেদিন ঘেন্না করেই হোক্ যাই করেই হোক্, কিশোরীবাবুর বমি সাফ্ করলি, অথচ তোর মা বেচারী মহিলা-আশ্রমে ভারি ডিউটি করে বাড়ি ফেরে, তোর বাবা…'

—সুজাতাদি।

—দেখ্ রবি, বিশ বছর আগে আমার মা মারা গেছে। তিরিশ বছর আগে আমার বাবা…কিন্তু এখনও মা বাবার কত খুঁটিনাটি কত ছোটখাটো কথা আমার মনে পড়ে। আসলে তোর মা-বাবার কথা মনেই পড়ে না…নে, যা তোর বাস এসে গেছে, উঠে পড়্। তোকে আবার বহুৎ দূর যেতে হবে।

সুজাতাদির তিরস্কারে রবির গলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু যতটা পারে হাল্কা গলায় বলল, আগে তুমি হোটেল থেকে খাবার-দাবার কেনো। তোমায় সাইকেল রিক্শায় তুলে দিই, তারপরে তো বাসে ওঠা।

সুজাতাদির পাশে পাশে হেঁটে তাই রবিও হোটেল অব্দি চলল। টিফিন ক্যারিয়ারটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে সুজাতাদি বলল, ডিমের ডালনা আছে?

—আজ্ঞে আছে।

—তিনটে ভাত আর ডিমের ডালনা দিয়ে দিন।

ম্যানেজার মাথা চুলকে সুজাতাদিকে বলল, একটা কথা ছিল।

—বলুন।

—বাচ্চাটা আমার বাড়ির সামনের ডাস্টবিনেই পড়েছিল। আচ্ছা, বাচ্চাটা বাঁচবে তো?

—আপনি যদি আগে তুলতেন বাচ্চাটাকে, সিওর হয়ে বলা যেত বাঁচবে। এখন আমি অতটা সিওর হয়ে বলতে পারছি না।

ম্যানেজার আর কোনো কথা না বলে টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে ভিতরে চলে গেল। দোকানের সামনে লাইট পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে সুজাতাদি ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে গুণছিল। দুটো নেড়িকুত্তার

বাচ্চা শিমুল ফল ফাটা তুলোর বলের ওপর থাবা দিয়ে সেগুলোকে কায়দা করতে গিয়ে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে রবি বলল, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম তুমি আমার ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পাও সুজাতাদি।

সুজাতাদি রবির দিকে একবার তাকিয়ে আবার পয়সা গুণতে লাগল।

—তোমার মায়ের স্মৃতি সুন্দর, তোমার বাবার স্মৃতিও খুব সুন্দর। তাই তুমি সব সময়ে তাদের কথা ভাবতে চাও। গলা উঁচু করে বলতে চাও। যাদের তা নয় তারা কি করে বল তো সুজাতাদি? তারা রেহাই চায়। কিন্তু সিন্ধ্‌বাদের কাঁধের সেই নাছোড়বান্দা বুড়োর মত সে স্মৃতি···

ম্যানেজারের হাত থেকে টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে সুজাতাদি টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলল।

একটা সাইকেল রিক্‌শাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে সুজাতাদি বলল,

—তুই একদম হেরে গেলি রবি, একদম হেরে গেলি।

—কেন সুজাতাদি?

সুজাতাদি তখন রিক্‌শায বসে পড়েছে। যাতে রিক্‌শাওলার কানে না যায়, সুজাতাদি একটু ঝুঁকে পড়ে বলল,

—আমার যখন সাত বছর বয়স, তখন আমার বাবা আমার মাকে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তারপর আমার মাকে শহরে গিয়ে এক ব্যবসাদারের ইনভ্যালিড্‌ বৌকে সেবা করতে হয়েছিল। বুঝলি।

সুজাতাদির রিক্‌শা ঘুরে এদিকে চলে যেতেই রবি আকাশের দিকে মুখ তুলল। অদ্ভুত আকারের কতগুলো ফল ডালে নিয়ে নেড়া শিমুল গাছটা চাঁদের সামনে সিলুয়েট হয়ে গেছে। রবি বাস স্টপের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে দেখল, তার পায়ের কাছে আবার দুটি শিমুল ফল ফাটা তুলোর নরম বল গড়িয়ে আসছে। সে অতি সন্তর্পণে

বলদুটি হাতে তুলে নিল। তারপর আস্তে আস্তে দুটি বল মিলিয়ে একটা মোলায়েম ঘন গোলক তৈরী করল। কি পবিত্র আর সুখ-স্পর্শ। আছে কি নেই এমন চিকন। যেন তার আর সুজাতাদির সম্পর্ক।

২

এ পাড়ায় আসার পর থেকে শেষরাতে ঘুম ভেঙে যায় রবির। এ সময়টা, ধরা যাক অন্তত দুটো ঘণ্টা, যেন পৃথিবীর কোনো বাঁধা-ধরা সময়ই না। নিটোল একটি ঘুমের নৌকো যেন আস্তে আস্তে এই শেষরাতের শান্ত ঠাণ্ডা হ্রদ জলের মত অপেক্ষারত চেতনার দিকে ধীরে ঠেলে দেয় রবিকে। সে আস্তে চোখ মেলে চুপচাপ গা ছেড়ে ভাসতে থাকে। রবির খাটের পাশেই আকাশ। কারণ জানলায় কোনো পর্দা নেই। গরাদ নেই। নিজের ইচ্ছে মত কখনো চোখ বন্ধ করে, কখনো বা খুলে রেখে সে আকাশকে স্পর্শ করতে থাকে। দিবানাথবাবু বলেন এ সময়টা নাকি ব্রাহ্মমুহূর্ত। এই মুহূর্তে রাত্রি আর দিনের জোড় খুলে আল্‌গা আর আলাদা হতে থাকে বলে বায়ু স্থির থাকে। রবি আজকাল যেন বায়ু স্থির এই কথাটির অর্থ বুঝতে পারে। কারণ সে যখন গা ছেড়ে চুপচাপ অচিন্ত্যে ভাসে, তখন অনেক মনে-না-পড়া গানের লাইন, হারানো কথা, অনেক সাধারণ ঘটনার গোপন তাৎপর্য চেষ্টা ছাড়াই কেমন আস্তে আস্তে আপনি উঠে আসতে থাকে। রবি যেন আভাসে বুঝতে পারে সে একটা অদ্ভুত কলসের চারপাশে পিঁপড়ের মত শুঁয়ো নেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনো-সখনো আস্বাদের আভাস কিংবা গন্ধও পাচ্ছে। শুয়ে শুয়ে নিজের ভিতরটা আস্তে আস্তে শূন্য করে দেওয়ার একটা অসহ্য সুখ আসে রবির ভিতর। তারপর সেই সুখটাই আস্তে আস্তে আবার তাকে পূর্ণ করে দিতে থাকে।

আজ যেমন টলটলে শুকতারার পিছনের হাল্কা হতে থাকা আকাশকে দেখতে দেখতে রবির ভিতর থেকে উঠে এলো আলোর সেই কথাটি—'আর তো ফিরে যাওয়া হবে না।'

কিন্তু আমি তো এখানকার কেউ না। আমি তো দু'দিনের অতিথি। এই খাট, এই নরম বিছানা ওই মাথার ওপর বন্ধ পাখা এ-সব তো আমার নয়। আমার এই কাল রাতে স্নান করে শোয়া, ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ মাখা ধৌত শরীর এ সবই তো মাত্র কয়েকটা মাসের বায়ু পরিবর্তন। আমাকে তো ফিরে যেতেই হবে।

যখন যেতে হবে তখন যা কিছু কষ্ট তা কিন্তু এই ভোরবেলাটির জন্যেই। কারণ এই ভোরবেলার দুঘণ্টার সমস্ত বোধটাই রবির জীবনে অভাবনীয়। নতুন।

বিছানায় শুয়ে আজকের কুড়িয়ে পাওয়া কথাটি রবি তার মনের মধ্যে জপের মত ঘোরাতে থাকে।

—'আর তো ফিরে যাওয়া যাবে না।'

তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্থির হয়ে অপেক্ষা করে থাকে রবি তার সেই প্রথম পাখিদের জন্যে। সে টের পায় রোজ ঠিক এই সময়টায় আকাশের অনেক ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যায়। এত উঁচু দিয়ে উড়ে যায় যে রবি তাদের আব্‌ছা ছায়াটুকু শুধু দেখতে পায় ডানার রং না। তাদের পাখনার ঝাপটানি আর কল-কাকলির মিলিত শব্দ পিস্টন আর হুইসলএর এক মিশ্র আওয়াজের মত মাত্র কিছুক্ষণের জন্য কাছে এসে দূরে মিলিয়ে যায়। ঐ বিশেষ পাখির ঝাঁকটার জন্যে রবির একটা আলাদা আকুলতা। কারণ ওরা কোনো ঘরোয়া সামান্য পাখি না। উত্তর থেকে দক্ষিণে কোথায় উড়ে যায় ওরা? এক বহুদূর থেকে আর এক বহুদূরে। রবি জানে ওদের কেউ তলায়, নিচে এই শহরটাকে খুঁটে খাবার জন্যে এতটুকু লোভ করে না। রবির জানালায় কিংবা বাইরের রাধাচুড়োর ডালে ওদের কেউ কোনো দিন নেমে আসবে না। খুচ্‌রো কিচ্‌মিচ করে ওঠার গেরস্তপনা নেই ওদের।

আজও পাখিরা আসে। পাখিরা চলে যায়। আর তাদের সমস্ত ওড়ার বেগ রবির রক্তের ভিতর কাঁপতে কাঁপতে চলে যেতে থাকে।

আস্তে আস্তে নিজের শরীরকে খুঁজে পেতে থাকে রবি। অনেক অশুচিতা জানে বলেই তার এখনকার শুচিতার জন্য গর্ব হয় চোখের পল্লবগুলি ক্রমশ ভিজে ওঠে।

পাতলা ফুল-কাটা চাদরের তলায় তার অনাবৃত চব্বিশ বছরের বুক। মসৃণ, হাল্কা রোমে ঢাকা। তার সুগঠিত ভাঁজ করা বাহুর ওপর রাখা মাথা। একটু বা দীর্ঘ, সিল্কের মত নরম চুল। রবি যেন জানালা দিয়ে দেখতে পায় বরানগরের বাদামতলা লেনের সরু গলির আর এক রবিকে। দেড়খানা খুপরির জানালাহীন পর্দা-টানা ছোট খোপ্‌টায় বিড়ির বাক্‌স আর দেশলাই নিয়ে জেগে উঠেছে রবির বাবা। রাস্তার মজে-যাওয়া ড্রেন খোঁচাতে খোঁচাতে জমাদারেরা অশ্লীল গালাগাল আর গন্ধ ছড়াচ্ছে। বড় খুপরিতে ভাইবোনদের সঙ্গে ঢালাও বিছানায় পাশের বাড়ির বুড়োর দম্‌কা কাশির আওয়াজে আচম্‌কা জেগে উঠেছে রবি। একটা আসঙ্গের স্বপ্ন মাঝপথে ভেঙে গিয়ে, রক্তাক্ত ক্রোধে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তার দেহ। ঘুম সম্পূর্ণ হয়নি তার। রাত এগারোটা বারোটায় রকের আড্ডা ভেঙে ঝাঁ-ঝাঁ চোখে উঠে আসে রবি। যেদিন বাবা আর মা'র ঝগড়া চলতে থাকে, পেটের জ্বালায় নাকে মুখে কিছু গুঁজে বাইরের রকে আবার গিয়ে বসে। আশেপাশের বাড়ির চাকরদের গজালি শোনে খানিকক্ষণ। তারপর সব নিঝুম হলে, ভাইবোনদের ঠেলেঠুলে সরিয়ে বিছানায় একটু জায়গা করে নেয়। কিন্তু মশার কামড়, গরম, বস্তির ঝগড়া, ঘেমো গেঞ্জি, অস্নাত শরীর, সাতদিন পরা প্যান্ট। ঘুম আসতে আসতে একটা, দেড়টা বেজে যায়। তাই সকালে, বেলা হয়ে গেলেও বিছানায় গুটিয়ে-সুটিয়ে শুয়ে থাকে রবি। মা তাড়াহুড়ো করলেও বালিশ আঁকড়ে পড়ে থাকে —ছাড়ে না।

রবি দেখছে সেই রবিকে। দোতলা বাড়ি থেকে দেখছে কিনা, তাই মনে হচ্ছে বরানগরের রবিটা অনেক নিচে। যেন একটা কুয়োর

ভেতর। আর কুয়োর ভেতরের সেই রবিটা স্বপ্নের চিন্নুকে ধরে রাখতে চাইছে তার বালিশের ফাঁকের রোমশ জান্তব অন্ধকারের ভিতর।

সাড়ে সাতটা আটটার আগে রবি উঠবে না। উঠে কি হবে? তার ওই ঘর দেখতে ভালো লাগে না, বাবার মুখ দেখতে ভালো লাগে না, মায়ের মুখের পড়তে-না-পারা ধাঁধার মত সঙ্কেত খুঁজতে ভালো লাগে না, বিশ্রী বাঁজা একটা সকাল কোলে নিয়ে কি রাজ্য লাভই বা হবে তার? তা সত্ত্বেও সে উঠছে। চোখ ধুয়ে কুলকুচো করে রাগে ফাট্‌তে ফাট্‌তে গায়ে একটা শার্ট গলালো। বাজারের থলি আর টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গলিতে। বেরিয়ে পড়ল বটে, কিন্তু এখনই সে বাজারে যাবে না। চিন্নুদের বাড়ির সামনের রকে গজালি করবে, গোপাল মন্নু আর পরেশের সঙ্গে। বাজারের থলিটা পাট করে লুকিয়ে রাখবে কায়দা করে। আর চোখ পেতে রাখবে চিন্নুদের এজমালি বাড়ির দরজায়। একটা বড়গলার ব্লাউজ পরে, ম্যাক্‌সি স্কার্ট ভর্তি বড় বড় বাঁধাকপির মত গোলাপ ফুল নিয়ে চিন্নু বেরোবে। হাতে কেৎলি নিয়ে। তার অতগুলো দিদি থাকা সত্ত্বেও মোড়ের দোকান থেকে চা আর গরম সিঙাড়া কিনে আনবে। রবিদের দেখে একটু হাসবেও চিন্নু। নাকে রিঙ্‌ পরা, অত ভোরেও ঠোঁটে রঙ। একটু গা দুলিয়ে, ঝাঁকি দিয়ে হাঁটা চিন্নু। আর ম্যাক্‌সি স্কার্টের দোলানিতে, বড় বড় বাঁধাকপির মত ফুলগুলো যেন রবির চোখের সামনে বড় হতে হতে ফেটে যাবে ক্রমশ।

বস্তির জমে থাকা জলকাদা চটি ছাপিয়ে পায়ের পাতার তলায় উঠে এলে সারা শরীর রি-রি করে ওঠে। সন্তর্পণে সেফ্‌টিপিনে আঁটা চটির স্ট্র্যাপ সাম্‌লে ক্রুদ্ধ উদ্ধত নিরুপায় রবি বাজারের দিকে এগোবে।

বিছানা থেকে উঠে আস্তে শরীরটা টান-টান করে আড়মোড়া ভেঙে নিল রবি। পরনে ছিল সাদা লঙ্‌ক্লথের ঢোলা পায়জামা।

ছোটমাসি ছোটমেসোর ওয়ার্ড্রোব থেকে দিয়েছে। তার ওপর খাটের পাশে রাখা ফিকে বাসন্তী রঙের কলিদার পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে নিল। আঙুল দিয়ে চুলগুলো একটু সাজিয়ে নিলেই তাকে বেশ লাগে। পায়ে শ্লীপার গলিয়ে মাঝের পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে গেল। এ ঘরে ফুলফোর্সে পাখা চালিয়ে দিয়ে ছোটমাসির ছেলে সায়ন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আবার এত গরম লেগেছে সায়নের যে হাল্কা খাটটাকে ঘরের মাঝখানে টেনে নিয়ে গেছে। পাখার তলায় জন্ম! এসব সায়নকে মানায় বৈকি। ছোটমাসিই কথাটা মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেয়। দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে ঘড়িটা দেখতে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে যেন হৈহৈ করে এগিয়ে এল ঝুলন্ত মানিপ্ল্যাণ্ট্, পেতলে বাঁধাই, ঠাসা কিউরিওকেস্ আর বাঁশকাঠিতে তৈরী বাহারে ক্যালেণ্ডার।

এ সব আমার জন্যে নয়। এ কথা ভাবতে ভাবতে রবি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল।

এত ভোরে বাড়ির লোকজনও ওঠে না। ঘুমের ওষুধ খেয়ে পড়ে থাকে বলে ছোটমাসিরও বেলা হয়। ছোটমাসিব পাশে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকে ওদের মেয়ে রূপু। শুধু ছোটমেসো ওঠে। নিচে গিয়ে কিচেন থেকে নিজের জন্যে এক কাপ দুধ চিনি ছাড়া চায়ের লিকার বানিয়ে নেয়। আধুনিক কেতার ডাইনিঙ্-রুম আর ড্রইংরুমের মাঝখানের পর্দা তোলা ছিল বলে রবি ছোটমেসোকে দেখতে পেল। একটা সিরামিক্সের ছোট মগ হাতে কিচেন থেকে বেরিয়ে আসছে। আবছা ভোরের আলোয় যেন জলে ডোবা মড়ার মত চোপসানো ফ্যাকাসে লাগছে ছোটমেসোকে। মাথার চুলের ছোপ ছোপ সাদায় উঠে যাওয়া কলপের লাল্‌চে ব্রাউন ছাপ। এত ভোরে ঠোঁট নেড়ে কথা বলতে ভালো লাগছিল না রবির। তাই একটু দৃষ্টি বিনিময় করে ঠোঁটে একটা স্মিতহাসি ফুটিয়ে রবি সদর দরজা খুলে বাইরে বেরোল। দরজার বাইরে দাঁড়ালে জগৎ

একেবারে হুম্ করে আলাদা হয়ে যায়। কি ভোর! কি ফুলেদের নাচতে থাকা মাথা। যেন জলের ঢেউ-এ নাচতে থাকা কাগজের নৌকা। ছোট্ট সাজানো বাগান পেরিয়ে, গেট খুলে রবি ফুটপাথে নামল। রাধাচূড়ার তলায় এখন দোমড়ানো হলুদ ক্রেপ্ কাগজের কুঁচির মত স্তূপাকার ফুল পড়ে রয়েছে। এ পাড়ার ঝাড়ুদাররা গাছের তলায় তলায় ঝরাফুল ঝাঁট দিয়ে নিয়ে যেতে আসেনি এখনো। ফুটপাথ থেকে নামলেই একশ ফুট চওড়া রাস্তা। হুহু চলে গেছে। রাস্তার ধারে ধারে বাড়ি। নতুন। আনকোরা। দূরে ছোট ছোট টিলাশ্রেণীর মত ফ্ল্যাটের সারি দেখা যাচ্ছে। এখানে এখনো সবই এত ফাঁকা ফাঁকা, যে চোখ অনেক দূব পর্যন্ত চলে যায়। বাধা পায় না।

রবি ফুটপাথের ওপর পা ফেলছে। শান্ত নিশ্চিত পদক্ষেপ। জেগে উঠতে থাকা নতুন শহরের সমস্ত মাস্টার প্ল্যানটার ছন্দ যেন ওর মাথার ভিতরে চলতে শুরু করেছে। একটা চুম্বক যেভাবে কাঁচা লোহার ওপর ক্রমাগত চলতে শুরু করে আর ক্রমশ ভিতরের অণুগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। রবির পাশ দিয়ে একটি ছেলে আরে মেয়ে যেন মাটিব এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল। মেয়েটি লম্বা স্বাস্থ্যবান ছেলেটির হাত জড়িয়ে, ছেলেটির গায়ে ভর দিয়ে দিয়ে কল্‌কল্ করে কথা বলছিল। হাতে একটা আধ-খাওয়া আপেল। হাল্কা কমলার ওপর কল্‌কা ছাপা কামিজ আর গোলাপী স্ট্রেচ্‌লনের বেলবট্‌সে দারুণ লাগছিল মেয়েটিকে। একটা উঁচু প্ল্যাটফরম হিলের জুতো পরেও ছেলেটির কাঁধ ছাপিয়ে যেতে পারেনি বেচারী। ব্যাপারটায় রবি বেশ মজা পেল। হঠাৎ তুজনকেই দারুণ ভালো লেগে গেল রবির। একটু বাদেই একশো ফুট চওড়া কংক্রীটের রাস্তার ওপর দিয়ে চার-পাঁচটি রঙিন সাইক্লে কয়েকটি কম বয়সী ছেলেমেয়ে ছোট ছোট কিটব্যাগ ঝুলিয়ে প্যাড্‌ল করতে করতে চলে গেল। কাছেই স্যুইমিঙ্ পুল।

ওদের সুগঠিত পায়ের পেশির ওঠা-পড়া, সঞ্চালন, বাতাসে ফুলে ওঠা শার্টের পিছন, রবির মনে হ'ল এই নতুন কলোনী যেন হাওয়ায় একঝাঁক রঙিন বেলুন উড়িয়ে দিয়েছে। রবির মনে পড়ল, একবার বরানগরে থাকতে খামোখা কেবল গায়ের ঝাল ঝাড়বার জন্য ওরা একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকাকে ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে নাজেহাল করেছিল। কিন্তু আজ, হঠাৎ কি যে হ'ল তার, নিজে সে এত টইটম্বুর হয়ে গেছে, যে একটা মেজাজী হলুদ-বসন্ত পাখির আদলে সে মনে মনে বলে উঠল—ওরা সুখী হোক্! সুখী হোক্! এই আশীর্বাদের মত শব্দগুলো, ওর নিজের ভিতর থেকে উঠে আসতে দেখে, রবি নিজেই খানিকটা থতমত খেয়ে গেল যেন।

রবি কি ভেতরে ভেতরে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে? এই নতুন গড়ে তোলা শহর, এই নক্শা-করা রাজ্যপাট, এ সবই কি রবিকে এত শান্ত করে দিচ্ছে?

ছোটবেলা বত্রিশ সিংহাসনের গল্প শুনেছিল রবি। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন কালক্রমে মাটির তলায় ঢাকা পড়ে যাবার পর সেই মাটির ঢিবির ওপর এক ক্ষেত্রপাল বানালো একটা ছোট চালা। চালায় বসে সে ক্ষেতের ফসল পাহারা দিত। কিন্তু কি আশ্চর্য, চালার ওপর বসলেই তার মনের ভাব হয়ে যেত উদার। সবাইকে ডেকে ডেকে সে বলত, 'এসো এসো যার যত চাই ফসল নিয়ে যাও আমার ক্ষেত থেকে।' কিন্তু চালা থেকে নেমে এলেই সে হয়ে উঠত স্বার্থপর, নোঙ্রা আর ছোট।

নতুন শহর? শহরের নতুন টুক্রো! তোমার তলায় কি বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন লুকোনো আছে?

আপন মনেই হেসে উঠল রবি এবার। কোথায় বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন? এই নতুন শহরের নিচে আছে উন্নত ধরনের আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ড্রেন্।

রবি এবার চলার গতি বাড়ালো। তিনদিন দিবানাথবাবুর সঙ্গে

দেখা হয়নি। তিনি কলকাতায় তাঁর ছেলেদের কাছে গিয়েছিলেন। আজ পার্কে আসার কথা। ভোরে বেড়াতে বেড়াতে দিবানাথবাবুর সঙ্গে গল্প করা তার নেশা। পার্কের নতুন রঙ-করা লোহার গেট্ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল রবি। ওই তো, এসে গেছেন! হাতে লাঠি, বেড়াচ্ছেন। রবি এগিয়ে গেল। রবিকে পাশে পেয়ে চোখ তুলে তাকালেন দিবানাথবাবু। তাঁর ওই ঘোর বাদামী রঙের অস্থির দুটি চোখের তারা রবির প্রিয়। কাঁচাপাকা স্থিতপ্রজ্ঞ ঘন ভ্রূর তলায় কেমন একটা বেমানান চঞ্চলতা। চোখের কোল থেকে কাকের পায়ের ছাপের মত লম্বা লম্বা দাগ নেমে এসেছে গালের উঁচু হাড়ে। লম্বা ছাঁদের মুখ হওয়ায় গাল চিবুক, চোখের কোল সবই বড় শীর্ণ লাগে। তবে মাথা ফাঁকা নয়। কাঁচাপাকা চুল সিঁথির দুপাশে আঁচড়ানো। লম্বা রোগাটে মানুষটি। লম্বার জন্যে, একটু যেন ঝুঁকে পড়া। সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবি আর সাদা পায়জামা পরা। হাতে সুদৃশ্য লাঠি রাখতে পছন্দ করেন। কিন্তু সেটায় ভর করে কখনো হাঁটেন না। রবিকে বলেছেন বয়স তো আসলে পঁয়ষট্টি। ষাট লেখানো ছিল বলে পাঁচ পাঁচটা বছর চুরি করে চাকরি করেছি। এখন ঝুলি থেকে আসল বয়সটা ঠিক বেরিয়ে পড়তে চায়।

খানিকটা পাশাপাশি পায়চারির পর বললেন, খবর-টবর সব ভালো তো?

—ভালো। আপনার?

—আর একটা বড় বাঁধন ছিঁড়ে এলাম এবার। গিয়েছিলাম একটা বেশি বয়সে করে রাখা ম্যাচিওর ইনসিওরেনেসর টাকা তুলতে। টাকাটা ছেলেদের ভাগাভাগি করে দিয়ে এলাম। এবার মেজো ছেলের স্ত্রীটি এসে আমার কাছে থাকতে চাইছিল। বলে দিয়েছি, 'নাথিং ডুইং!'

দিবানাথবাবুর কথাবার্তাই অমনি। কাঠ্‌কাঠ্‌। কিন্তু কণ্ঠস্বরটি গম্‌গমে। ভরাট। কানে শুনতে ভালো লাগে।

মেজোবউকে দুদিন এখানকার বাড়িতে থাকতে দিলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত ? তবে রবি মুখ ফুটে কিছু বলল না। কারণ এই একমাসে সে দিবানাথবাবুর ধরন-ধারণ দিব্যি বুঝে গিয়েছে। দিবানাথবাবু তাঁর কাজকর্ম সম্বন্ধে কারো কোনোরকম মতামত বা পরামর্শ শুনতে একদম নারাজ।

বুকভরে খোলা হাওয়া টানতে টানতে দিবানাথবাবু বললেন,

—আঃ, এখানে ফিরে এসে যেন বাঁচলাম। কি খোলা-মেলা। কি হাওয়া। কাল রাতে ফিরেছি। ফিরে খেয়ে-দেয়ে তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়েছিলাম। ছেলেদের ওখান থেকে ফেরার পর মাথাটা একেবারে গরম হয়েছিল। ঘুম আসছিল না। হঠাৎ এপাশ ওপাশ করতে করতে একটা কথা মনে হ'ল জানো। হঠাৎ মনে হ'ল—

রবি চোখ তুলে তাকালো দিবানাথবাবুর দিকে। তিনি তৎক্ষণে তাঁর উঁচু মাথাটি রবির কানের কাছে নামিয়ে এনে বললেন, সংসারে কাউকে কাউকে বোধ হয় বাল্মীকিব দুর্ভাগ্য নিয়ে আসতে হয়। আমাকেও হয়েছিল। আমি বুঝতেও পেরেছিলাম। কিন্তু হাত-পা বাঁধা। উপায় ছিল না। তুমিই বলো না রবি, খামোখা ছেলে মেয়ে বউকে গিয়ে কখনো বলা যায় তোমরা কেউ আমার পাপের ভাগ নেবে কি ? আর দুম্ করে সব দায়-দায়িত্ব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে নিজের চারপাশে উইঢিবি গজিয়ে 'মরা' 'মরা' জপ করতে শুরু করে দেওয়া যায়।

দিবানাথবাবুব কথার ভঙ্গিতে রবি হেসেই উঠেছিল। কিন্তু দিবানাথবাবু হাসলেন না। রবি দেখল একটা অপ্রতিরোধ্য ইমোশনের ধাক্কায় তাঁর সারা মুখ দুমড়ে মুচ্‌ড়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন,

—এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে বাল্মীকি হওয়া। বড্ড দেরি হয়ে গেল, না ? আর বাল্মীকিই বা হব কেন ? আমার অত ভগবানে-

টগবানে ঝোঁক নেই। জানো রবি, আমি এখন বেশ আমার নিজের মত করে বাঁচতে চাই।

'নিজের মত করে বাঁচতে চাই?'—এটা তো একটা শোনা কথা। আজকাল লোকে প্রায়ই বলছে। রবিও একটা আধুনিক জনপ্রিয় নাটকে এই ডায়ালগটা নায়িকাকে বলতে শুনেছিল। তখন অবশ্য শুনতে বেশ ভালোই লেগেছিল, কারণ চমৎকার আলোকসম্পাত আর শব্দক্ষেপণের দিব্য কেরামতি ছিল। দিবানাথবাবু কি দৈবাৎ নাটকটা দেখে ফেলেছিলেন? কে জানে! তবে না দেখারই চান্স্। কারণ সারাটা জীবনই তো স্যামুয়েল জোন্‌স-এর অফিসে মহাপ্রতাপান্বিত বড়বাবুগিরি করেই দিন কেটে গেল তাঁর।

আরো খানিকক্ষণ পায়চারি করে একটা লালে লাল কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় সবুজ রঙ-করা বেঞ্চে বসল রবিরা। ঠিক সামনেই একটি চবুতরা। সেখানে সাদা পাথরের কয়েকটি পায়রা। যেন দানা খাচ্ছে। মাঝখানে ফোয়ারা। ফোয়ারার জলের ছিটে লেগে লেগে পায়রাদের গায়েও হাল্কা শ্যাওলার ছিটে লেগেছে। তাই তাদের হঠাৎ কেমন জীবন্ত দেখাচ্ছে। এত বিশাল পার্কের পক্ষে ভোরের ভ্রমণকারীর সংখ্যা নগণ্য। সেই সুন্দর মত মেয়েটি বেঞ্চে বসে গালে হাত দিয়ে বই পড়ছে। রোজ যেমন পড়ে। কপালে গুঁড়ো চুল উড়ে পড়ছে। হাওয়ায় উড়ছে হাল্কা রঙের ছাপা শাড়ির আঁচল। রবি দেখেছে মেয়েটি মিনিবাসে চড়ে কলকাতায় পড়তে যায়। ওর দাদু চক্কর দিচ্ছেন। এত ব্যস্ততা যেন ট্রেন ধরতে হবে। ভারি নরম ওর মুখের ডোলটি। রবির দুঃখ হয়। বরানগরে ফিরে গেলে আর কি মেয়েটির সঙ্গে দেখা হবে?

এই পার্কেই রবির সঙ্গে দিবানাথবাবুর প্রথম আলাপ। চক্কর দিতে দিতে দ্বিতীয় রাউণ্ডেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লাঠিটা উঁচিয়ে—প্রায় খোঁচা দেন আর কি—বলেছিলেন,

—এটা কি ভাবে হ'ল?

মিথ্যে দিয়েই আরম্ভ করতে হয়েছিল রবিকে। প্রথমে বোমা-টোমা শুনলে কদ্দূর কি বিশ্বাস করবেন কে জানে? মিথ্যেটার প্রথম লাইন ছোটমাসির শেখানো। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবি মোটর সাইক্ল অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। গলায় সাইক্লের স্পোক্ ঢুকে যায়। তারপর অবশ্য মিথ্যের সঙ্গে মিথ্যেই জুড়তে হয়। রবির বয়সী যে ছেলের মোটর সাইক্ল থাকে, সে কি করে বরানগরের বাদামতলা লেনের দেড়খানা ঘরে থাকে?—তার বাড়ি মিথ্যে করে হতেই হয় যোধপুর পার্কে। মাকে বানাতে হয় ইনভ্যালিড্। আর বাবা বিজনেস্ নিয়ে ব্যস্ত। তাই শরীর সারানোর জন্য মাসির কাছে আসা। অবশ্য বছরখানেক আগে হলেও এত মিথ্যের পরও রবির চেহারা দেখে সন্দেহ হতে পারত। একেবারে রুক্ষ ময়লা চেহারা। এখন হাসপাতালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যত্নে থেকে গায়ে গত্তি লেগেছে খানিকটা। তারপর মাসির বাড়ির আরামে বেশ সুখী সুখী মোলায়েম একটা ভাবও এসেছে। যদিও মাসির ছেলে সায়নের মত, এখনও বসন্তের হাওয়াটি বইলেই পাখা চালানোর অভ্যেস করতে পারেনি রবি, তবু বাইরের ঠাটবাট এমন করে ফেলেছে যে তাকে দেখলে পাখার তলায় জন্মানো ছেলে বলেও দিব্যি ভুল হতে পারে। অবশ্য একটা সত্যি কথাও মিথ্যের সঙ্গে বেশ মিশ্ খাইয়ে বলেছিল রবি। সেটায় কোনো দোষ হয়নি। সে সত্যিই বলেছিল, সে কমার্স গ্র্যাজুয়েট। বছর দু-এক আগে পাস করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে দিবানাথ প্রশ্ন করেছিলেন,

—তা, পাস করেছ যখন, বসে আছো কেন?

রবি গলার ক্ষতটা দেখিয়ে বলেছিল, 'এই যে, এটার জন্যে।' না হলে তো কবেই মামার বন্ধুর ফার্মে জয়েন করার কথা। কাজ শিখতে শিখতে চাটার্ড পড়বে। অবশ্য সবটাই কাল্পনিক। ওই মামার বন্ধুর ফার্ম, চাটার্ড অ্যাকউন্টেসি পড়া, মায় স্বয়ং মামা

পর্যন্ত। তবে পুরো কল্পনাই বা হবে কেন? বি. কম. পড়ার সময় কলেজের অনেক সহপাঠীকেই তো বলতে শুনত রবি, তাদের মামা আছে। মামারা আগে ভাগে সব ব্যবস্থা তৈরী করে রেখেছে। কেবল পাসটা করলেই হবে।

মাটিতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে দিবামাথ বললেন, এবার তোমার কথা বল। আমি যে বলেছিলাম আইডল্ বসে না থেকে একটু এম. কম. কোর্সের বইগুলো উল্টেপাল্টে ছাখো! তোমার লাস্ট্ অপরেশনটা তো মাইনর। সেটার আর কত দেরি? এই অপরেশনের ব্যাপারটাও বানানো। রবি দিবানাথবাবুকে বলেছে তার গলায় আর একটা প্লাস্টিক সার্জারি হবে। মাসির কাছে তাই রেস্ট্ নিচ্ছে। একটা চব্বিশ বছরের ছেলে খামোকা মাসের পর মাস কাজ নেই পড়া নেই চুপচাপ বসে আছে, এ ব্যাপারটা এই নতুন বসতিতে সত্যিই দৃষ্টিকটু। দিবানাথবাবু উঠে দাঁড়ালেন। —নাঃ আকাশ লাল হয়ে গেছে। দিন বড় হচ্ছে বুঝলে। আরো ভোর ভোর আসতে হবে। আর ঘোরা নয়। চলো ফেরা যাক্। তুমি তো আমার ওখান হয়েই বাড়ি যাবে। আরে চলো না। তোমাদের বাড়ির ব্রেকফাস্ট তো সেই বেলা আটটায়।

রবি দিবানাথবাবুর সঙ্গে চওড়া রাস্তা পেরিয়ে ওপারে চলল।

ওপারটা কলোনী নয়। নতুন শহরও না। মানুষজন এখানে ওখানে খালি জমিতে টুক্‌টাক্ নিজেদের মনোমত বাড়ি করেছে। কিন্তু এখনো বেশির ভাগ জমিই নিচু। বাসের অযোগ্য আগাছা আর কচুরিপানায় ভরা। রাস্তা পেরিয়ে বেশ খানিকটা এব্‌ড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে হেঁটে তবে দিবানাথের বাড়ি। ছোট বাড়ি। মাত্র একখানি ঘর। একটি দালান। চারপাশে সামান্য জমি। জমিতে একটি শিউলি আর একটি নিমগাছ বড় হয়ে আছে। দিবানাথবাবু দশ বছর আগে যখন জমি কিনেছিলেন তখন এই দুটি গাছকে বুড়ো বয়সে সঙ্গী হবে বলে পুঁতে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে রবির কাছে

আফসোস্ করেন, একটা কাঁঠালি চাঁপা পুঁতলাম না কেন? আমার কাঁঠালি চাঁপা ভারি ভালো লাগে। বড্ড ভুল হয়ে গেল। বুঝলে!

চাবি খুলে ঢুক্‌লো দুজন। তক্‌তকে দালান। সাদা সিমেণ্ট্ করা। রুজুরুজি জানলা আছে। বন্ধ ছিল। রবি খুলে দিল। সামনেও দরজার দুপাশে জোড়া জানলা। দালানেই ছোট বেঞ্চির ওপর জনতা, হিটার চায়ের সরঞ্জাম আছে। ছোট জালের আলমারিতে রান্না করা খাবার থাকার ব্যবস্থা। কেরোসিন কাঠের তৈরি করা আলমারিতে চালডাল থাকে। দালানে একটি তক্তপোশ আর কয়েকটি মোড়া। ব্যস্ আর কিছুই নেই। ঘরের তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন দিবানাথ। একটি ছোট রেফ্রিজারেটর। দেয়ালে বসানো বই-এর তাক। নেয়ারের খাট আর টুকিটাকি রাখার টেবিল। এ ঘরে একটি চেয়ারও আছে। এবং একটি ফ্যান্। বাড়িতে কোনো ফটোগ্রাফ্ নেই! দেয়ালে তিনি একটি মাত্র ক্যালেণ্ডার রেখেছেন। যার প্রত্যেক পাতায় একটি করে ফোটা ফুলের ছবি। বাড়িটিকে দিবানাথ নিজের বানপ্রস্থের আস্তানা বলেন।

রবি জানলা খুলে, পাখা খুলে চেয়ারে বসল। দিবানাথবাবু পাশের বাথরুমে গিয়ে হাত-পা ধুতে লাগলেন। একটু বসে বিশ্রাম করে তিনি চায়ের জল চাপাবেন। হরলিক্‌সের শিশি থেকে ছোট ছোট গোল বিস্কিট বের করবেন। রবির বিস্কিটে বড় বড় চিজের টুকরো দেবেন, ফ্রিজ্ থেকে বের করে। নিজে খাবেন একটুখানি টুকরো। তারপর চা ছেঁকে খেতে খেতে একটু গল্পগাছা হবে। বাড়ির ঠিকে ঝি আসবে। খবরের কাগজ আসবে। রবি বিদায় নিয়ে বাড়ি যাবে।

আজও প্রায় তাই-ই হচ্ছিল। হঠাৎ একটা বাড়তি ঘটনা ঘটে গেল। জানলা দিয়েই দেখা যাচ্ছিল একটি অল্পবয়সী ছেলে সন্তর্পণে কড়া নাড়ছে। রবি গিয়ে দরজা খুলে দিল। দিবানাথ-বাবুকেই চায় সে। দাদু, দাদু বলছিল। দালানে বসতে দিয়ে রবি

দিবানাথবাবুকে ডাকল। বাইরে বেরিয়ে এসেই খানিকটা অপ্রসন্ন হলেন দিবানাথ। ছেলেটি নিচু হয়ে প্রণাম করতেই রবি বুঝতে পারল ছেলেটি তার জাতের ছেলে। রোগা, পিঠের ওপর শার্টে রিপুর দাগ, কলার থেকে সুতো উড়ছে। পায়ের আঙুলের ফাঁকে কমদামী প্লাস্টিকের চটি পরার কড়া।

—দাছু, আমি আপনার সেজ বোনের নাতি। অঞ্জন। আমার মাকে আপনি পুঁটু বলতেন!

—মানে নমিতার ছেলে। তা নমিতাদের তো বেলঘরিয়ায় বাড়ি না?

—হ্যাঁ। বাবা তো নেই। ছু'বছর হ'ল মারা গেছেন। ক্যানসারে। থেমে থেমে কথা বলছিল ছেলেটি। আমি এখন চাকরির চেষ্টা করছি। এ বছর বি. এস. সি পার্টটু পাস করেছি। মা আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

—আমার কাছে? আমার কাছে কেন?

দিবানাথ বিরস মুখে ছেলেটির দিকে তাকালেন। আমি কি করতে পারি? রবি উঠে গেল। কেট্‌লিতে বাড়তি চা আছে কি না সে দেখতে চায়। ছেলেটিকে একটু দেবে। বিস্কিটও ছু-চারটে দিলে হয়।

—মা বলছিলেন, আপনি নাকি এখনও স্যামুয়েল জোন্‌স-এ একটা চিঠি লিখে দিলে আমার একটা চাকরি হয়ে যায়। পিওন-বেয়ারার চাকরি হলেও আমার আপত্তি নেই।

রবি চা বিস্কিট এনে অঞ্জনের সামনে ধরল। একটু কুঁজো হয়ে রবির হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নেবার সময় অঞ্জন তার দিকে তাকাল একবার। চোখের কোল ছুটি গর্ত, গালের মাঝখানটা অসমতল। আগুনের কাছে আমপাতা রাখলে যেমনটা হয়।

দিবানাথ বললেন, দেখো বাপু, তোমার মাকে বলো মানুষের কাজের সংসারে আমি মরে গেছি। আমার ছেলেরাও আমাকে মরা

মানুষের মত ধরে। আমার আর কোনো কিছুর সঙ্গে যোগ নেই। যোগ রাখি না। বিষয় সম্পত্তি সব ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছি। চাকরি থেকেও ছুটি নিয়েছি। পাকা মাথা বলে সাহেবরা রাখতে চেয়েছিল আরো কটা বছর। এখন আর পুণ্য করি না-করি, পাপ করতে চাই না। চিঠিপত্র সুপারিশ ও সব আর আমার দ্বারা হবে না। সাহেবরাও যে আমার কথা শুনবে তেমনও আমি আশা করি না।

—মা বলছিলেন—

অঞ্জনের গলার স্বরটি হতাশায় ভেঙে, নেমে গেছে।

—বলছিলেন দিবুমামা আমায় বড়ো ভালোবাসতেন,—

দিবানাথ একবার তাকালেন অঞ্জনের দিকে। বললেন,

—হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের মতই দেখতে হয়েছ।

রবির মনে হ'ল যেন দিবানাথের গলাটা একটু কেঁপে এল।

অঞ্জন উঠে দাঁড়াল। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, বড্ড বিরক্ত করলাম দাদু। আমি যাই এখন।

—এস।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে অঞ্জন বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। দিবানাথ বললেন, কি ? রবি দেখলে। বাল্মীকির পেন্‌সন কত কষ্টের। আমাকে দিয়ে পাপ কাজ করিয়ে নেবার জন্যে এখনও কড়া নেড়ে লোক চলে আসে। হ্যাঁ, এই এত দূরেও। ঠিকানা নিয়ে। না বাবা, আর পাপ কাজ করছি না। জীবনে অনেক—অনেক পাপ করেছি।

রবি বলল, জীবনে না হয় আর একটা পাপ কাজ করতেন ! বলেই একটু হাসল। দিবানাথ খানিকক্ষণ রবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ও, সমবয়সী কিনা, তাই সিম্প্যাথিটা ওদিকেই গেল,—স্বাভাবিক ! স্বাভাবিক।

রবির খুব অস্বস্তি লাগছিল। মাঝে মাঝে সমস্ত ব্যাপারগুলো

জোড়াতাড়া দিতে তার, বেশ কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হয় দিবানাথও ঠিক তারই মত, তার কাছে রেখে-ঢেকে কোনো মিথ্যে পরিচয় দিচ্ছেন কিনা। তিনি হয়ত যা নন তাই সাজতে চাইছেন। নিজেকেই মিথ্যে স্তোকবাক্য দিচ্ছেন। কে জানে?

দিবানাথ চায়ের পেয়ালা বিস্কিটের প্লেট কেটলি সব কোণে গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে রবির সামনে বসলেন। ঠিকে ঝি এসে বাসন তুলছিল আর তার ঠুংঠাং শব্দ। নিমগাছের সবুজ ছায়া দুলছে জানলার বাইরে। একটা নীল মাছি এসে রবির গায়ে বসল, দিবানাথ বললেন,—আমাদের সময় অল্প বয়সে বিয়ে-থাওয়া চুকে যেত। বিয়ের আগেই বাবা স্যামুয়েল জোন্‌স-এ ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমার স্ত্রী তেমন সুন্দরী ছিলেন না বলে বাবা দেঁড়ে-মুষে পণ নিয়েছিলেন। সেই পণের টাকায় কলকাতার গরাণহাটায় আমাদের বসতবাড়ির পত্তন। বাবা বাড়ি করার নেশা মাথার মধ্যে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে জানলা দরজা কিনতে যেতাম। কড়িবরগা কিনতেও। বাড়ি ভাঙা হচ্ছে খবর পেলেই দরকার মত ভালো পুরোনো বিল্ডিং মেটিরিয়াল সস্তায় কিনে আনতাম। সে জন্য পান খেতে, জল খেতে অফিস থেকে ঘুষঘাস নিতে হতো বৈকি। এখন বৌমারা মুখভার করেন। নিচের তলার সঙ্গে ওপরতলার মিল নেই। এ ঘরের সঙ্গে ও ঘরের। জানলা দরজা সব সেট্ মেলানো নয়। আমি যখন ওদের সঙ্গে ছিলাম তখন বলতাম, তা বেশ তো, ভেঙে গড়াও। মনে মনে ভাবতাম চুরির টাকায় এমনি বাড়িই হয়। এর চেয়ে বেশি নয়। তোমাদের স্বামীদের তো ডাকাতির টাকা।—তা, সে বাড়ির নিচের ছুটো তলা আষ্টেপৃষ্ঠে ভাড়া দিয়ে ছেলেরা তিনতলা চারতলা তুলেছে। অবশ্য সেট মিলিয়ে। বড় থাকে তিনতলায়। মেজ চারতলায়। স্ত্রীর বেলা যেমন পণ পেয়েছিলাম বৌমাদের বেলাও তেমনি নিয়েছি। কিন্তু বেশি পারিনি। ছেলেরাই মূলধন হিসেবে অর্ধেক টাকা বের

করে নিল। তারপর বৌমাদের পাওয়া গয়নাগাটি জিনিসপত্র পাখা রেডিও ফ্রিজ তো আর আমার মেয়েদের বিয়েতে দেবার জন্য আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়েদের কাছে চাওয়া যায় না। আমার বড় ছেলের দ্বিতীয় পক্ষ। আমার প্রথম পক্ষের বড় বৌমাটি এত ভালো ছিল যে যখন বাবা বাবা করে কাছে আসত, সেবা করত তখন মুখখানি দেখে লজ্জাই হত মনে মনে, আহা, এমন মেয়েকে গুণে গুণে পণ দিয়ে তবে ঘরে এনেছি। তা মেয়েদের বিয়েতেও তো দেখলাম। রীতিমত পার্টি-টার্টি করে এমনি জামাই-এর বাবাও তো হাত পেতে টাকার তোড়া নিল।—রবি, এ তো আমার জীবনের আউট লাইন। আরো ডিটেলেও বলতে পারি তোমাকে।

কিন্তু জানো, এ সবই বাইরে বাইরে ঘটছে। ছোটবেলা থেকেই একটা জোয়ালে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। নিজের দোষে বেরোতে পারিনি। ভেতরে কিন্তু একটা মানুষ ছিল। ভিতরে ভিতরে ঠিক ছিল।

হাল্কা একটা রোদের রেখা নিমগাছের পাতার সবুজ লেশ্ ভেদ ক'রে ঘরে এসে পড়েছে। বাসন-কোসন মেজে-ধুয়ে রেখে গেল ঝি। দিবানাথ ভাত বসাবার জন্য উঠছেন না।

—একটা ছোট্ট ছেলে। একটা ছোট্ট ছেলে আর তার মায়ের সঙ্গে তার কথাবার্তা। ছোটবেলা একবার মায়ের প্রিয় একটি মাটির কৃষ্ণঠাকুরের মূর্তি খেলা করতে করতে ভেঙে ফেলে হাপুস নয়নে কেঁদেছিলাম। মা আমার কষ্ট দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, ওতে কোনো পাপ হয় না। কারণ তার কিছুদিন আগে কালীঘাট থেকে নরকে কি কি শাস্তি হয় তার এক ছবি কেনা হয়েছিল। ছবিটা মন দিয়ে দেখতাম আর পাপের শাস্তির কথা ভেবে, ভয়ে আতঙ্কে আমার হাত-পা হিম হয়ে আসত। মনে আছে সেদিন আমার কান্না অনুতাপ আর ভয় দেখে মা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন—'জানিস খোকা, পাঁচ বছর পর্যন্ত অন্যায় করলে কোনো পাপ লাগে না।

এরপর আর তুই কোনো পাপ করিস না। কেমন!' রবি, কত পাঁচ বছর চলে গেছে। আমার বাবা কত অল্প বয়সে তাঁর পাপের চেয়ারের পাশে আমাকে বসিয়ে দিলেন। বিয়ে দিলেন। বাঁধা পড়ে গেলাম। বাড়ির ভিত তৈরী করে গেলেন। ঘর তৈরীর নেশা ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন মাথায়। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবেই মানুষ যা করে তাই করেছি। অল্পস্বল্প ঘুষ নিয়েছি। অনেক পেয়ারের লোককে কারচুপি করে চাকরি-বাকরি পাইয়ে দিয়েছি। ছেলেদেরও এমন সব লাইন ধরিয়ে দিয়েছি যে তাতে বাঁকা রাস্তায় গেলে রীতিমত মুনাফা। বেশ ছিলাম। দুই ছেলের সংসারে, নাতি নাতনী নিয়ে, শেষ বয়সের আরামের সম্মানের চাকরি নিয়ে প্রবল প্রতাপে ছিলাম। একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো—

রবি চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল কথা বলতে বলতে দিবানাথবাবুর মুখের সমস্ত গড়নটাই যেন কেমন বদলে যাচ্ছে। চোখের গভীর কোল দুটিতে একটু চিকচিকে রুপোলী জল।

—একদিন আমার ছোট্ট মেজো নাতি বাজার থেকে একটা আপেল এনে খাচ্ছিল। মেজবৌমা সন্ধেবেলা একটু-আধটু মার্কেটিং-এ বেরোতেন। আমি পিঙ্কুকে জিজ্ঞেস করলাম, কে আপেল দিয়েছে তোমায় পিঙ্কু!

—কেউ দেয়নি আমি তুলে এনেছি—

হঠাৎ আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। আমি বললাম, তুমি জানো, না বলে আপেল তুলে আনলে তোমার পাপ হবে। সাজা পাবে। ছোটবেলার সেই নরকের ছবির বর্ণনা করলাম পিঙ্কুর কাছে। তারপর হঠাৎ কত বছর পরে আমার মায়ের কথা মনে পড়ল। মা সেই বুকে চেপে ধরে বলেছিলেন, আর পাপ কোরো না, তোমার কোনো শাস্তি হবে না। মায়ের সেই দুঃখী মুখটা মনে পড়তেই মনে মনে খুব কষ্ট হ'ল। আমি পিঙ্কুকে বললাম, তোমার মা জানলে কত কষ্ট পাবেন বলো তো!

পিঙ্কু অম্লান বদনে বলেছিল. মা জানে! মা চোখের কোণ দিয়ে দেখে, কিচ্ছু বলে না।

সেদিন সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি রবি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম সমস্ত জীবন নিজে কত পাপ করেছি। নিজে করেও ক্ষান্ত হইনি, নিজের সন্তানদেরও—

দিবানাথ হাত তুলে এমনভাবে তাকালেন যেন পাপের বিপুল ভারকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, ঠেলা দিয়ে সরিয়ে রাখছেন।

—আমার বয়স এখন পঁয়ষট্টি বছর। দশ বছর আগে আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমি জীবনটা একেবারে বাজে খরচ করে দিয়েছি। তবু বেরোতে পারিনি। চাকরি বাকি ছিল। বাড়ির দায়-দায়িত্ব ছিল। এই দশ বছরের মধ্যে পাপ করেছি। উপায় ছিল না। এ বাড়িটা বানিয়েছি ছমাস হ'ল। এক বছর আগে আমার পেন্‌সন হয়েছিল। আমার এই নতুন জীবনটার বয়স মাত্র পাঁচ মাস। সারা জীবনে আমি এই পাঁচ মাস সত্যিকারের বেঁচে আছি। ভাবা যায়!

তাই বলছি, তুমি যতই বল, আর একবার, আর একবার, এই শেষবার, আর নয়,—বলে পাপ করতে থাকলে করে যেতেই হয়। রেহাই নেই। তাই হঠাৎ একদিন এভাবেই কোথাও না কোথাও থেকে দুম্ করে আরম্ভ করে দিতেই হয় রবি। উপায় নেই। কোথাও না কোথাও থেকে, যদি দরকার হয়, সন তারিখ দেখে, ডায়েরী লিখে, খোঁটা পুঁতে নিজেকে দু-কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে, খাড়া করে আরম্ভ করতেই হয়। উপায় নেই।

৩

রবি কিন্তু ছোটমাসিকে সত্যি কথা বলেনি। আসলে সে ডাক্তার দেখাতে কলকাতায় আসেনি। এসেছিল এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেঞ্জের কার্ড রিনিউ করতে। অবশ্য চাকরি-চাকরি করে এখনই ঘুরে বেড়ানোর দরকার নেই রবির। ছোটমাসি তাকে আরো একমাস বিশ্রাম করতে বলেছে। তারপর ছোটমাসি আর ছোটমেসোর ইচ্ছে রবি ছোটমেসোর অফিসেই জয়েন করবে। কমাস কাজ করে ঘাঁৎ-ঘোঁৎ সব বুঝে নিলে পিনাকীবাবুকে ছাড়িয়ে দেবে ছোটমেসো। লোকটাকে মেসোর নাকি একদম পছন্দ নয়।

দুপুরের ডালহাউসি বিরক্তিকর। রোদে পোড়া। ভিড়ে থিক্‌থিকে ভাঙাচোরা মলিন জীর্ণ আস্তবের ওপর মাঝে মাঝে সংস্কারের বিপুকাজ থেকে এতদিন সুখে আরামে কাটানো রবির দেহমন ছুটে যেতে চাইছিল নতুন শহরের ঠাণ্ডা লেবু রঙের ডিসটেম্পার-করা সেই শান্ত ঘরটায়। পেটভরে লাঞ্চ খেয়ে ঝরোকা টেনে দিয়ে চমৎকার একটি দিবানিদ্রা। কার্ড রিনিউ করে একটা খালি 'এল' মার্কা বাসে উঠলে হতো। হয়ত এ বাসেই উঠত নতুন শহরের সেই কলকাতার কলেজে পড়তে আসা মেয়েটি। একটা চোখাচোখি, চেনাচিনি—হয়ত একটু আলাপ-সালাপ হওয়ারও সুযোগ হয়ে যেত। সমাজের একটা স্তর ফুটো করে আর একটা স্তরে পাচার হয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু রবি হঠাৎ ঠিক করে ফেলল আজ সে বরানগরে বাদামতলা লেনে যাবেই। খুনী যেমন বার বার তার অকুস্থলে ফিরে যেতে চায়, ওই ফিরে যাওয়ার দুর্বলতায় ধরা দিতে চায়, রবিও তেমনি। কাল রাতে সুজাতাদি রবিকে ফোন করেছিল। সুজাতাদি আলোকে আর হাওড়ার ওই আস্তানায়

রাখতে চায় না। রবি যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারে। তাই যেন সেই অজুহাতে রবি আজ বাদামতলা লেনে যাচ্ছে। রবির মা একটা মহিলা সমিতিতে বড়ি তৈরী করে, পাঁপর বেলে দেয়। আরো কি সব ফুরনের কাজকর্ম করে। মাকে একবার বলে দেখলে হয়।

কিন্তু শুধু কি সেই জন্যেই? আর কোনো কারণ নেই? রবি কি নতুন শহরের নিরিবিলি গাছের সারির সবুজ পাতার লেশের ভিতর দিয়ে, আকাশের পাৎলা নীল পরকলা'র ভিতর দিয়ে দিয়ে, যেন গ্রন্থান্তরের মত সেই বাদামতলা লেনটাকে আরো বেশি করে দেখতে পায় না?

বাদামতলা লেন বড় রাস্তা থেকে অনেকদূর। একটা সোজা রাস্তার গা থেকে এঁকেবেঁকে বস্তি আর ভদ্রবাড়ির গায়ে পড়াপড়ির মধ্যে দিয়ে বাদামতলা লেন আবার গিয়ে মুখ খুলেছে আর এক সোজা রাস্তায়। এই সরু লেন থেকে আবার বাই লেনও বেরিয়েছে কয়েকটা। গলির সরু মুখটায় ঢুকলে হঠাৎ হাওয়া বন্ধ লাগে, একটু বা অন্ধকার। দু পাশে ছায়া ঘনিয়ে আছে। মাঝখানে ফিতের মত সরু রোদের ফালি।

গলির মুখেই দেখা হ'ল মুরলীর সঙ্গে। এই তো সেদিন বোনের শাড়ি পরে, গায়ে বৌদির চাদর জড়িয়ে রকে বসে থাকত মুরলী। আর মাঝে মাঝে খুব দমকা কাশিতে ভুগত। দুপুরবেলা একটা মান্ধাতার আমলের ট্রানজিস্টার খুলে ক্রমাগত হিন্দী গান শুনত। সেই মুরলী আবার পার্টি-টার্টিও করল কিছুদিন। তার কেমন যেন ধারণা হয়েছিল রবি তার অপোজিট্ পার্টি। তাই দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত। সেই মুরলীই আজ কিনা গলি থেকে বেরিয়ে আসছে। ধোপদুরস্ত শার্ট আর ফুল প্যান্ট্ পরে। হাতে পোর্ট-ফোলিও। বেশ দেখাচ্ছে মুরলীকে। রবিকে দেখে মুরলীও চমৎকৃত। তার দিকে চেয়েও মুরলীর দুচোখ উল্লাসে চক্‌মক্ করে উঠল,

—আরে রবিদা, কদ্দিন পরে? বাঃ বেশ দেখাচ্ছে তো! মাসিমা বলছিলেন ভালো চাকরি করছ দুর্গাপুরে!

মুরলীর কথায় উত্তর না দিয়ে রবি বলল,

—তুই কি করছিস মুরলী, পার্টি-টার্টি সব ছেড়ে দিয়েছিস?

বস্তির দেওয়ালে লেখা মলিন সব স্লোগানেব দিকে তাকিয়ে বলল,

—বড্ড পার্টিপলিটিকস্ ববিদা। বড্ড কচকচি। বাস্তার মোড়ে মোড়ে ঝগড়া মাবামাবি। আব কতদিন এইভাবে ভালো লাগে বলো,—তোমাব নামেও তো বটে গিয়েছিল, তুমি নাকি হাসপাতাল থেকে অ্যাব্সকণ্ড্ কবেছ। পার্টিব লোকেবা তোমায় মার্ডাব করবাব জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেন? অ্যাবসকণ্ড্ কেন?

মুরলী আব কিছু বলল না। একবাব শুধু দেওয়ালেব গায়ে আব্ছা হয়ে আসা একটা ছাপ মারা চিহ্নর দিকে তাকাল।

রবি হাসল। মুরলীকে আসল কথা বলে 'কি লাভ? মুরলী কি বিশ্বাস করবে? হাসপাতালে যেদিন প্রথম কথা বলতে পেরেছিল সেদিন মা যখন জিজ্ঞেস কবেছিল, ববি সত্যি কথাই বলেছিল। কিন্তু মাও বিশ্বাস করেনি। পুলিশও বিশ্বাস করেনি। অনেকদিন ধরে ববির সম্বন্ধে খোঁজখবব কবেছিল। সময়টাই অবিশ্বাসের কাল। একটা বিশ্বাস ধরতে না ধরতেই ভেঙে পড়ে। দেওয়ালে একটা লিখন পড়তে পড়তেই হাজারটা। সবাই বলে আমরাই ঠিক আমরাই মুক্তি এনে দেব।' কিসের মুক্তি? মুক্তি কি হঠাৎ আসে। না মুক্তিকে ভেতব থেকে খুঁজে বেব করতে হয়?

অস্পষ্ট একটা স্লোগানের দিকে তাকিয়ে রবি মুরলীর কাঁধে হাত রেখে বলল,

—তা, তুই এখন কি করছিস বল?

—একটা পারফিউম কোম্পানীর সেল্সম্যান হয়েছি রবিদা।

যাতায়াতের খরচ দেয়। কমিশন দেয়। আবার বাইরে গেলে ট্রেন ভাড়া, অ্যালাউয়েন্স, খাওয়ার খরচ সব। প্রথম প্রথম একজন সিনিয়র সেল্সম্যানএর সঙ্গে বেরোতাম। এখন একা একাই বেরোচ্ছি।

—চাকরি কেমন লাগছে বল্।

—খুব ঘোরাঘুরি। রোদ নেই, জল নেই। কিন্তু বেশ লাগে বাবিদা। শুধু একটা ভয়, কোনো সিকিউরিটি নেই। কোম্পানী তেমন চালু নয় তো। যে কোনোদিন চাকরি চলে যেতে পারে।

সত্যি, একবার কাজের স্বাদ পেয়েছে মুরলী। বাদামতলা লেনের বাইরের জগতের স্বাদ! আর কি মুরলী রকের ওপর দুপুরবেলায় বোনের শাড়ি লুঙ্গি করে পরে, না-পুরুষ না-মেয়ে হয়ে বিবিধ ভারতী শুনে শুনে সময় কাটিয়ে দিতে পারবে।

মুরলীর পাশ দিয়ে বাদামতলা লেনের আরো ভিতরে এগিয়ে গেল রবি। গেনী ধোপানীর ঝুঁকে-পড়া চাঁচের ঘরের সামনের দুমুখো উনোনের একমুখে ভারি ইস্ত্রি গরম হচ্ছে। আর একমুখে তাওয়ায় মোটা মোটা রুটি সেঁকছে গেনীর ছেলে বুধিয়া রাস্তায় চৌকি পেতে বসে বসে। ওপরের তার-বাঁধা বাঁশ থেকে ঝুলেছে পাখির খাঁচা। একটা টিয়াপাখি তুড়ুক্ তুড়ুক করে লাফাচ্ছে তার ভেতর। এক ঝলকে অনেকখানি স্মৃতি ফিরে এলো রবির মনে। তাড়াতাড়ি পাশের খুপরির দিকে তাকালো। খুপরিতে চাবি দেওয়া। কাছে এগিয়ে এসে বুধিয়ার মাথাটা নেড়ে দিয়ে রবি বলল, কিরে বুধিয়া, চিনতে পারছিস!

ফ্যালফ্যাল করে খানিকক্ষণ রবির দিকে তাকিয়ে থেকে বুধিয়া একগাল হেসে বলল, হাঁ—আ

বহুদিন কলকাতায় আছে গেনী আর গেনীর বর। ভালো বাংলা বলে। তবে বুধিয়াদের তো এখানেই জন্ম। ওদের কথায় কোনো দেহাতী টানই নেই, গেনী ভিতরে উঁচু চৌকির ওপর ইস্ত্রি

করছিল। ওর নেশাখোর স্বামীটা উবু হয়ে বসে বিড়ি টানছিল চোঁ চোঁ করে।

—মুন্নী বুঝি আর তোর পাখি উড়িয়ে দেয় না।

বুধিয়া হেসে বলল—না বাবু। ওরা দেশ চলে গেছে।

—এলে বলিস বাবু খোঁজ করেছিল।

ভিতর থেকে গেনী বলল, মুন্নীরা আর ফিরবে না দাদাবাবু! এবার ওরা একেবারেই চলে গেছে। একটু একটু করে জমীন কিনে বয়েল করে—একদম চলে গেছে শহর থেকে। ওখানেই খেতী করবে। এবার সারাবছর হয়ে যাবে ওদের। মুন্নীদের খুপরিতে কাল থেকে লোক চলে আসছে বাবু। দেশওয়ালী পেয়েছি।

মুন্নীর রোগা রোগা চেহারাটা মনে পড়লো রবির। বস্তির একটা ছোট্ট রুগ্ণ ধোপাদের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই মুন্নীর বাবা-মাকে দেখছে রবি। গেনীর পাশের খুপরিতে থাকতো। ধোবার কাজ করত, তিন চারটি নেণ্ডী-গেণ্ডী বাচ্চা। তাদের মধ্যে মুন্নীটা কলকাতায় এলেই ভুগত বলে দেশে আয়ীর কাছে থাকত। রবিরা যে রকে জটলা করত তার কাছাকাছি রাস্তায় খেলত বস্তির ছেলে-মেয়েগুলো। একদিন ভোরে গেনীদের চেঁচামেচিতে লোক জড়ো। বুধিয়ার টিয়াটা উড়িয়ে দিয়েছে মুন্নী। মুন্নীর মা কম কথার মানুষ। সে হাত জোড় করে বলল,—'ছোট মেয়ে, দোষ করে ফেলেছে। ও বুধিয়াকে আচ্ছা পাখি কিনে দেবে আবার!' মুন্নী ঘাড় কাত করে বলেছিল, 'কেনো, কেনো না! আমি আবার উড়িয়ে দেব!'

অদ্ভুত মেয়ে তো? রবি একদিন কাছে ডেকে নিয়ে বলেছিল, হ্যাঁরে মুন্নী, তুই পাখিটাকে উড়িয়ে দিলি কেন?

বড় বড় দুটো চোখ। ফ্যাকাসে রঙ। একপেট পিলে। পিঠে সেফটিপিন দিয়ে জামা আটকানো, জটা-পড়া চুলের একটা সাত বছরের মেয়ে। বলেছিল, গন্ধা জায়গা। আলো নেই, হাওয়া

নেই। ওকে আমি উড়িয়ে দিয়েছি তাই। ও আমাদের গাঁয়ে উড়ে যাবে। খেতীতে নেমে গেঁহু খাবে।

অদ্ভুত মেয়ে তো। মাঝে মাঝে মুন্নীর সঙ্গে গল্প করতো রবি। কলকাতা মুন্নীর ভালো লাগে না। বিচ্ছিরি। পৃথিবীতে সবচেয়ে সেরা জায়গা ওদের গাঁও। সেখানে কি আলো! কি হাওয়া! বড় বড় মাঠ। ইম্‌লি গাছ। কুয়োর জল কি মিষ্টি। আব আয়ীব সঙ্গে সে খেতীতে যায়। সেখানে সোনালী বঙের গেঁহু ফলে থাকে। সেই গেঁহু খেতে নামে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। কত রকম পাখি। তাদেব মধ্যে টিয়াও থাকে। তাদের গাঁয়ে একটা নদী আছে। নদীর ধাবে মন্দিব। সন্ধেবেলা আয়ী আর সে সেখানে রামায়ণ শুনতে যায়। তাদেব ঘরও সুন্দর। কত জায়গা। চালে বড বড় চাল কুমড়ো ফলে। উঠোনে গেঁহু শুকোতে দেয় চৌকোনা করে। আয়ী জাঁতায় গেঁহু পেষে। আচার বানায়। মিষ্টি আটার রুটি দিয়ে আচার খেতে মুন্নীব বড় স্বোয়াদ লাগে। রবিকে মুন্নী কথা দিয়েছিল তাদের গাঁয়ে নিয়ে যাবে। ঠিক নিয়ে যাবে। অদ্ভুত মেয়েটা, কলকাতাব গলিব অন্ধকাব থেকে পাখি ছেড়ে দেয়। অদ্ভুত!

রবি গলি দিয়ে এগোলো। মুন্নী এখন কোথায়? কলকাতা থেকে তার গাঁয়ে যেতে পাক্কা দুদিন লাগে। সেই ততদূরে মুন্নী এখন তাদের নিজেদের জমীনে। নিজেদের খেতীতে। দুপুর রোদে ভাসতে থাকা গমের সোনালী ক্ষেতের মাঝখানে হুহু হাওয়ায় গা-ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মুন্নীর খুশিতে জ্বলজ্বলে মুখটা দেখতে পায় রবি। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে তার মাথার ওপর নীল আকাশে। টিয়াও উড়ছে। রবি দেখতে পায় নদীর ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে, ঝুঁকে-পড়া তেঁতুলগাছের তলায় মোটা মোটা গমের রুটি আচারে মেখে ছিঁড়ে খাচ্ছে মুন্নী।

রবির সারা বুকে সেই খোলা হাওয়া আর রোদ্দুরের নিশ্বাসে

ভরে যায়। সে মনে মনে ভাবে এমনও হতে পারে একটা ছোট্ট টিয়া, একটা সামান্য পাখিও মুক্তি পেলে আশীর্বাদ করে যায়। করতে পারে।

চিন্নুদের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল রবি। একটু আশ্চর্য হ'ল, কারণ উল্টোদিকের রকে কেউ নেই। এ সময়টায় কিন্তু গোপাল মন্নু পরেশ কেউ না কেউ ভাত-টাত খেয়ে-টেয়ে এখানে আড্ডা মারতে আসে। চিন্নুর বেহায়া দিদিগুলোর কেউ বাড়ি থাকলে দুচারটে রসের কথা-টথাও চলে। রবি তেরছা করে তাকালো চিন্নুদের প্যাসেজটার দিকে। সরু প্যাসেজে বসে বসে চিন্নুর একটা দিদি লোটনের বউএর সঙ্গে পান চিবোতে চিবোতে হেসে হেসে কথা বলছিল। রবি তাড়াতাড়ি সরে গেল। যাবার আগে কেন যে তার চোখে পড়ল দড়িতে ঝোলানো চিন্নুর সেই ম্যাক্সিটা। রঙ্ জ্বলে শ্রীহীন হয়ে গেছে। বড় বড় বাঁধা কপির মত ফুলগুলোর অস্তিত্বই নেই আর। রবির স্বপ্ন থেকে চিন্নুর অনেকখানিই যেন ঘষে জ্বলে শ্রীহীন হয়ে গেল। রবির খুব ইচ্ছে করল চিন্নুকে নতুন শহরে নিয়ে যেতে। একদিন ভালো করে রেস্তোরাঁয় খাওয়াতে পারলেই চিন্নু ঠিক চলে যাবে।

গলিটা একটু টাল খেয়ে ডাস্টবিনের কাছ থেকে বেঁকে গেছে। সেখান থেকে কানাগলি। গলির ভেতর মাটিতে নিচের তলা বসে যাওয়া রবিদের এজমালি বাড়ি।

চটের পর্দা সরিয়ে রবি নিচু হয়ে ভেতরে ঢুকলো। বাইরে থেকে এই দরজার মুখটুকুতেই সামান্য আলো আসে। রবির মা বাবার একটা ছেঁড়া ধুতি পরে জবুথবু হয়ে জনতায় কি যেন গরম করছিল। রবিকে দেখে চমকে উঠলো।

—ওমা, রবি! আয় বোস্।

মায়ের কাছে পিঁড়ের ওপর বসে রবি বাবার খোপের দিকে তাকালো। মনে হ'ল বাবা নেই। রবি কিন্তু উল্টোই ভেবেছিল। পেন্সনের পর দুপুরবেলাটা বাবা আর বাড়ি থেকে বেরোয় না। মা

বেরোয়। ভাইবোনরাও স্কুলে গেছে। দেওয়ালের কোনো রং নেই। খাওয়া খাওয়া। গুটোনো বিছানাগুলো মরচে পড়া ট্রাঙ্কের ওপর রাখা। ট্রাঙ্কগুলো ইটের ওপর। দড়িতে ঝোলানো কয়েকটা জামা-কাপড়। একপাশে ভাইবোনদের ছেঁড়াখোঁড়া বই খাতা। রবি থাকতে মমতাজের একটা ফটো সেঁটেছিল দেওয়ালে। এখন মমতাজ কোথায়? কোন ময়ূর মাধোয়ানীর ঘর করছে। এখন এবাড়িতে থাকলে রবি হয়ত জীনত আমন কিংবা পারভিন বাবির ছবি টাঙাত। যাকগে—

—বাবা কোথায়?

—আজকাল দুপুরে কি সব কাজে বেরোয়। তবে নেশাও ছাড়েনি। রেসও না!

রবি চোয়াল শক্ত করে চুপ করে রইল। এ সব কথার সে কোনো উত্তর দেয় না।

—তুমি মহিলা সমিতিতে যাওনি?

—আজ শরীরটা ভালো নেই। কদিন ধরে হাসপাতালে দেখাচ্ছি। মহিলা সমিতির ওপর আবার ঝন্টুবাবুর মায়ের রান্নার কাজটাও ধরেছি···আসলে খোকার ইস্কুলের একজন মাস্টারকে পড়াতে রেখেছি। মাস্টাররা বলছে ভালো করে পড়ালে খোকা নাকি জলপানি পাবে! তা খোকা মাঝে মাঝে বলে, কেন এত কষ্ট করো মা। আমি খেটেখুটে যা লিখব, কত ছেলে টুকে তার চেয়ে ভালো লিখে দেবে! হ্যাঁরে রবি এইসব টোকাটুকি কবে বন্ধ হবে বলত?

রবি হঠাৎ মুখস্থের মত করে বলে উঠল,

—একটা দিন তারিখ ঠিক করে ফেলতে হবে। কোথাও না কোথাও থেকে আরম্ভ তো করতেই হবে!

—কি বলছিসরে বিড়বিড় করে? মা সাবুটা নাড়তে নাড়তে বলছিল!

—নাঃ কিছু নয়। নিজের মনেই একটু হাসল রবি—তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছিলাম! একটা মেয়েকে মহিলা সমিতিতে কাজকর্ম দিতে পারো? তোমাদের কোনো মহিলা যদি ওকে রাখে তা হলেও ভালো হয়। খুব দুঃখী মেয়ে!

—মহিলা সমিতিতে কাজ আছে। কিন্তু মেয়েটিকে রাখবে কে? কত বয়স?

—সতেরো-আঠেরো হবে হয়ত। দেখ না কাউকে বলে!

মাথা নাড়ল রবির মা।—আচ্ছা! দেখব!

রবি তাকিয়ে দেখল মার মাথার অনেকগুলো চুল সাদা হয়ে গেছে। রোগা আর কুঁজো হয়ে গেছে মা। মায়ের কিসের অসুখ?

—হাসপাতালে যাচ্ছ বলছিলে। কেন?

—ডাক্তার বলছে পেটে একটা চাকার মত কি হয়েছে। ওটা ভালো করে দেখানো দরকার।

—লতুকে কাজকর্ম করতে বলতে পারো। ওর তো বয়স হচ্ছে!

বোনের বাড়ন্ত চেহারাটা মনে পড়ল রবির। বড্ড ফেল করে। তাই ধেড়ে মেয়ে ক্লাস সেভেনেই পড়ে আছে। একটু বোকা-সোকা। ভালোমানুষ টাইপের।

—না না লতু অনেক সাহায্য করে। তবে বুঝিস তো আমারও বয়স হচ্ছে!

রবি বিছানাটা পেতে জুতো খুলে খানিকটা গড়িয়ে পড়ল। পেটের মধ্যে একটু খিদের ভাব যেন চিন্‌চিন্‌ করছে। কিন্তু মায়ের সামান্য রান্নাবান্নায় ভাগ বসাতে ইচ্ছে করল না তার। বিছানায় বালিশে ভাইবোনদের গায়ের চেনা গন্ধ। দেয়ালে পলেস্তরা ভেঙে ভেঙে তৈরী সব অদ্ভুত ছবি। রবি কল্পনা করে নিত একটা বড় ফুটবল গ্রাউণ্ড। খেলা চলছে।

—নীপু কেমন আছে ? সুজন ?

—ভালো !

—ভালো থাকলেই ভালো। তোর বাবা বোধহয় সুজনের ওখানে যায়-টায়। সুজনদের সেই কর্মচারী পিনাকীবাবুও আসেন এখানে। মাঝে মাঝে দু-চারটে মালপত্তরও রাখেন আমাদের এখানে। বেশ লোক। ওর বাড়ি নাকি কাছেই। কালীতলায়। কিছু খাবিরে···

—নাঃ। একটু রেস্ট্ নেব। আব্ছা গলায় রবি বলল। তারপর হঠাৎ বলল, ঝন্টুবাবু কি সেই আগের মতই আছেন ?

রবির মা খানিকক্ষণ চুপচাপ পাথরের মত বসে রইল। তারপর বলল—কেউ কি চিরকালই এক রকম থাকে রে ?

হাতের ভাঁজে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল রবি। সে নিজে যাই-ই হোক কিন্তু মাকে সে ক্ষমা করেনি, বাবাকেও না, সংসারের অমতে বিয়ে করেছিল বাবা। তারপর চাকরি-বাকরিতে তেমন সুবিধা না করতে পেরে নেশা-জুয়া ধরল। আপিসের লোকেরা দয়া করে ভাগ্যি চাকরিটা রেখে দিয়েছিল। তাই বাবা এখন একটা সামান্য পেন্সন পায়। মার উপর অত্যাচার করত। মা লেখাপড়া শেখেনি। অনেক উঞ্ছবৃত্তি করেও চালিয়েছে। মায়ের বাপের বাড়ির অবস্থা তত ভালো ছিল না যে মাকে তারা দেখবে। দাদু নাকি বলতো, আমার বড় মেয়ে মরে গেছে। মা'ও শত অভাবেও কোনোদিন বাপের বাড়ির দিকে যায়নি। হয়ত আত্মসম্মানে লাগতো যার জন্যে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে, সেই-ই যদি এমন জগতের বার হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবি মাকে ক্ষমা করেনি।

বাবার ওপর অভিমান করে অল্পবয়সী মা'কে পাড়ার অনেক বৌদি বলা লোকজনের কাছে কাঁদুনি গাইতে দেখেছে। শেষ পর্যন্ত উপোস করে করে কাহিল হয়ে পাড়ার ঝন্টুবাবুদের বাড়ি আয়ার কাজ নেয় মা। সকাল আটটায় যেত। আর সেই রাত আটটায়

আসত। রবি তখন ছ-সাত বছরের ছেলে। ঝণ্টুবাবুর বৌ বলত, ওই ছেলেপুলে পিছুটান নিয়ে আসা চলবে না বাপু। দশবার করে ওদের দেখতে যেতেও পারবে না। মা তাই রবির কাছে একমাসের বোনটিকে রেখে ঝণ্টুবাবুদের বাড়ি আয়ার কাজ করতে যেত। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা। এক বছর রবির ইস্কুল যাওয়া হয়নি। বোনটিকে নিয়ে সে ভয় পেত। তার কাঁথা বদলানো, ছধ খাওয়ানো, কান্নাকাটি অসুখ-বিসুখ। রবির মায়ের অনুরোধে পাশের ঘরের হেনা কাকিমাও খানিকটা দেখাশুনো করতো। ক্বচিৎ কখনো মাকে ডাকতে ঝণ্টুবাবুর বাড়ি গেল ঝণ্টুবাবুর বড় ছেলে সঞ্জু রবিকে খেলতে ডাকত। রবির মা অমনি চোখের শাসন করে বলত—'না, মনিবের ছেলের সঙ্গে খেলতে নেই বাবা।'

রবি তাই কখনো সঞ্জুর সঙ্গে খেলেনি।

রোজ রাতে ঝণ্টুবাবুকে নিয়ে রবির মায়ের সঙ্গে রবির বাবার ঝগড়া হতো। রবির মা বলত,—বেশ তাই-ই যদি মনে করো কাল থেকে কাজ ছেড়ে দি। দেখব কে গেলায় তোমার ছেলেমেয়েদের। ছি, ছি, কোথায় নেমে এসেছি আজ। নেশাখোর রেসুড়ে অপদার্থ একটা স্বামীর জন্যে শেষ পর্যন্ত একটা আয়া, আয়া হলাম আমি।

তারপর একদিন হঠাৎ মাকে ডাকতে গিয়ে রবি ঝণ্টুবাবুদের দোতলায় চলে যায়। ঝণ্টুবাবু আর ঝণ্টুবাবুর বৌ ছুটো আলাদা ঘরে থাকতো।

অতর্কিতে ঝণ্টুবাবুর ঘরের কাছের বারান্দায় এসে পড়ে রবি স্পষ্ট দেখেছিল তার মা ছুটে বেরিয়ে আসছে। ঝণ্টুবাবুর হাতে মায়ের আঁচল।

এ সব দৃশ্য রবি মাঝে মধ্যে দেখেছে। বস্তিতে, পাড়ায়। এ-বাড়ি ও-বাড়ি।

কিন্তু মা ?

মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেই ছোট্টবেলাতেও রবি মাকে বলেছিল—ঝণ্টুবাবুরা মনিব। তুমি আমায় মনিবের ছেলের সঙ্গে খেলতে বারণ করেছিলে। আমি কিন্তু কখখোনো খেলিনি মা।

সাবুটুকু খেয়ে মাদুর পেতে রবির কাছেই বসল মা।

—খোকা খুব ভালো হয়েছে জানিস রবি। খুব ভালো। সব সময় পড়াশুনো করে। কোনো কুসঙ্গে মেশে না। হ্যাঁরে ও কদ্দিনে চাকরি-বাকরি করতে পারবে?

রবি বুঝতে পারল মা ওর আশা ছেড়ে দিয়েছে। মার কাছে রবি কেবল কখনো-সখনোর অতিথি। তাই মায়ের আশা এখন খোকাকে নিয়ে। রবির ভিতরে ভিতরে খুব কষ্ট হ'ল।

—সত্যি ভয় করে রবি। হাসপাতালে তো দেখাচ্ছি। যদি খারাপ রোগ-টোগ কিছু বলে, ক্যানসার-ট্যানসার, হাসপাতালেই অনেকদিন থাকতে হয়, খোকা আর লতুকে দেখবে কে বল্?

রবি জানত, মা বাবার আশাও অনেক—অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছে। তার খুব কষ্ট হতে লাগল। মায়ের দিকে তাকাতে তার চোখ পুড়ে যাচ্ছিল। সে আলতো করে বলল, আমাকেই বা দেখার লোক কে আছে?

মা রবির কথাটা ভালো মত বুঝতে পারেনি। বলল—কি বলছিস?

—আমারও তো কোনো হিল্লে হ'ল না এখনো, ছোটমাসির ওখানে আছি বটে। কিন্তু সে তো ওয়েটিং রুমের মত মনে হয়।

—কি বলছিস? নীপু কি যত্নআত্তি করে না?

—খুব করে! কিন্তু···সে আমি তোমায় বোঝাতে পারব না।

রবি উঠে পড়ল। জুতো-টুতো পরে রেডি। মা ওই ভাবে বসে থেকেই বলল,

—তুই সুখে আছিস বলে মনটা পাথর করেছি। কখনো আসতে

বলিনি, কখনো বিরক্ত করিনি নীপুদের। তোর বাবা বলে এই নরক থেকে বেরিয়ে ছেলেটা বেঁচেছে। আমিও তাই বলি—

রবি চটের পর্দাটা সরিয়ে বেরোল। তার সমস্ত অন্তরাত্মার মধ্যে থেকে একটা কান্না উঠছে। মা, বাবা, খোকা, লতু—তোদের ছেড়ে আমি বাঁচতে চাই, আলাদা বাঁচতে চাই! না, এই নরকই আমার ভালো, এই নরকই!

রবি গলির মধ্যে দিয়ে এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ছোটবেলার স্মৃতিতে মগ্ন হয়ে গিয়ে অভ্যস্ত পায়ে পাশের আর একটা কানাগলিতে ঢুকে পড়ল। এ গলির শেষ মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে ওপাশের রাস্তার এক বাড়ির পিছনের দেওয়ালে। আড়াই হাত কাঁচা গলি। শ্যাওলায় পিছল। কেউ ঢোকে না। খেলার ছলে এককালে রবিই ঢুকতো। কারণ গলির শেষের দিকে যে আলো-বাতাসহীন ঘরখানা, সেটায় কাঠের নড়বড়ে জানলা খুলে একলা থাকে, সেখানে পড়াশুনো করত প্রণব আর তার ছোট ভাই দেবু। দিনের বেলাও সে ঘরে আলো জ্বলতো। রবি মাঝে মাঝে গলিতে ঢুকে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে হঠাৎ ডেকে উঠে চম্‌কে দিত প্রণবকে। আজও তেমনি একটা ইচ্ছে হলো হঠাৎ। জানলা দিয়ে উঁকি দিতেই রবি চম্‌কে উঠল। জানলার চওড়া পাটায় পাগলের মত মুখ ঘষছে প্রণব। তার মুখে নীলচে ফেনা। রবিকে দেখে একটা হাত তুলে চিৎকার করে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল প্রণব। রবি পাগলের মত ছুটে গিয়ে সামনের দরজা খুলে প্রণবদের দিকের দরজার কাছে গেল। এ বাড়িও এজমালি বাড়ি। প্রণবদের বাড়িঅলা দোতলায় দাঁড়িয়ে ছিল। রবি পাগলের মত বন্ধ দরজা ঠেলছে দেখে বললো, সকাল থেকেই দরজা খুলছে না ওরা। দুধঅলা ফিরে গেছে। পাওনাদার ফিরে গেছে। কাজ করার ঠিকে ঝি ফিরে গেছে। কি আতান্তর বলো তো। ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে ঠিক আছে। তা বাইরের লোকগুলো কি দোষ করল?

রবি দুহাত ওপরে তুলে বিকৃত স্বরে চিৎকার করে বলল, 'বিষ খেয়েছে, বিষ। দরজা ভাঙান! দরজা ভাঙান!'

প্রণবের বাবা মা ছোট ভাই-এর মৃতদেহ আর প্রণবের মুমূর্ষু দেহ অ্যামবুলেন্সে তুলে দেবার পর রবি আর দাঁড়াতে পারছিল না। সে টলতে টলতে বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছিল। তখন চিনুর মেজদি রবিকে হাত ধরে নিজেদের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল।

—চল রবি, আমাদের বাড়ি গিয়ে একটু চা জলখাবার খাবে।

চিনু গলির মুখেই দাঁড়িয়েছিল। খুব রোগা কালো হয়ে গেছে। গালে শুক্‌নো ব্রণের কালো কালো দাগ। রবিকে দেখে বলল—তুমি ভাগ্যিস এ পাড়ায় এলে রবিদা, ভাগ্যিস গলির মধ্যে গিয়েছিলে তুমি। না হলে প্রণবদাও বাঁচতো না।

রবি হাঁটু মুড়ে রকের ওপর চুপচাপ বসে রইল। এই পাড়ার মধ্যে এক গায়ে গায়ে একটা পরিবার শুখিয়ে শুখিয়ে মরে যাচ্ছিল, কেউ ঘুণাক্ষরে জানতেও পারেনি!

কেন, কিসের ভয়ে, কিসের অভাবে? কিসের আতঙ্কে। প্রণবদের ঘরের মধ্যে কার দৈন্যদশা রবিদের চেয়ে বেশি নয়। বরং কম। এখনও একটা হাত-মেশিন আছে, একটা অ্যালার্ম ক্লক। কিছু আসবাবপত্র, জামাকাপড়, বিছানাপাতি, আলমারির মধ্যে কি আছে তা ওরা জানে না। পুলিশ 'সিল্‌' করে দিয়েছিল। কিন্তু প্রণবের বাবার চাকরি ছিল না। কারখানা লক আউট। প্রণবের বাবা ভাড়া দিতে পারেনি তিনমাস। দুধের দাম বাকি। প্রণবরা আর পড়াশুনো করত না।

পরেশ গোপাল মনু বীরু চাঁদু সবাই রবির পাশে বসেছিল। সেই পুরোনো রকে সেই সব পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আর সে ভাবে বসা হলো না রবির। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে গলির অন্তপ্রান্তের

মুখ দিয়ে গিয়ে ছোট রাস্তাটা পেরিয়ে সে বাস রাস্তায় এলো। এখান দিয়ে একটা প্রাইভেট্ বাস চৌরঙ্গি পর্যন্ত যায়।

বাস রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল রবি। কদমগাছের তলায়। এ পাড়ায় বেশ কয়েকটা কদমগাছ আছে। মাথা উঁচু করে তাকালে কদমগাছের সোজা উঠে যাওয়া কাণ্ডর গা থেকে বেরিয়ে আসা ছড়ানো ছড়ানো ডালের ভেতর দিয়ে পাতার রাশ দেখা যায়। বসন্তের নতুন বড় বড় সবুজ পাতা। থাক থাক উঠে গেছে। এখন বিকেলের রোদে ঝলমল করছে তার চূড়া। রবির ভিতরে একটি কথা শুধু বেজে উঠছে, 'ভাগ্যিস গলির মধ্যে গিয়েছিলে তুমি। না হলে প্রণবদাও বাঁচত না।' শাদা অ্যামবুলেন্সগুলো তো এই গাছতলা পেরিয়েই চলে গেলো। তাদের মধ্যে প্রণবও আছে। তার ধুক্‌পুক প্রাণটুকু নিয়ে। অথচ অলক! রবি তাকাবে না স্থির করেছিল। তবু একদল ছেলের কলকল চৎকারে দৃষ্টি পড়ল তার ছোট্ট শহীদ বেদীটার ওপর। ধপাস্ ধপাস্ করে ফুটবলের মার দিচ্ছে তারা বেদীটার ওপর। বিনা টিকিটে দূরের একটা বড় পার্কে খেলতে যাবার পরামর্শে আছে। বহুদিন পরে ক্রোধে রবির চোখ জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু সামনের দেয়ালে লেখা দুই যুযুধান রাজনৈতিক দলের বুশ্রী পরচিকীর্ষার ভাষার দিকে তাকিয়ে সে যেন ঠাণ্ডা মেরে গেল হঠাৎ। মনে পড়ল, সিনেমা দেখে ফিরছিল সে আর অলক। বড় রাস্তা থেকেই এক ট্যাক্সি পিছন পিছন আসছিল তাদের। এখানে কদম-গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বলছে। হঠাৎ একটা জ্বলন্ত কি যেন ছুটে এসে ফেটে গেল রবির সামনে। লক্ষ্যটা ছিল রবিই। লাগল গিয়ে অলকের বুকে। অলক কিছু বোঝবার আগেই ঘুরে পড়ে গিয়ে বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। রবির খানিকটা জ্ঞান ছিল। ট্যাক্সি থেকে দু চারজন নেমে এলো। 'চল, চল যদি না মরে থাকে, তুলে নিয়ে যাই।' তারপর রবিদের মুখে আলো ফেলে

চম্‌কে উঠে একজন আর একজনকে বলল,—আরে ছি ছি, একি! এরা তো নয় রে, এরা নয়,···ধ্যেৎ সব ভুলভাল হয়ে গেল। ছিঃ! তোরা ঠিক দেখেছিলি তো, সিনেমা হলে ঢুকলো নীল শার্ট কালো প্যান্ট!

ট্যাক্সিটা যতক্ষণ ছিল পাড়ার কেউ নামেনি রবিদের কাছে। সব জানলা দরজা বন্ধ করে সিঁটিয়ে ছিল। রবির মনে পড়লো জ্ঞান হারাবার আগে সে ভেবেছিল বাঃ বেশ তো, সব কি সস্তা প্রাণ! গেলেই হলো। যেন মিনি মাগ্‌না—

একটা বাস আসছে। রবি উঠতে না উঠতেই আর আশপাশ দিয়ে উঠে পড়ল ফুটবল বগলে বিনা টিকিটের বাচ্চারা।

কোনোদিন যে কথাটা মাথায় আসেনি রবির, আজ হঠাৎ এলো। বাসে বিনা টিকিটের এই যাত্রীদের কথাবার্তা, চাল-চলন, টিকিট-না-দেওয়ার বাহাদুরির গল্প অন্যযাত্রীরাও তার মত অম্লানবদনে শুনছে। দেখছে। রবিও রোজ দেখে। কিন্তু ঠাহর করে না। হঠাৎ তার মনে হলো এদের সকলের বাবাই কি দিবানাথবাবুর মত, কিংবা তাঁর মেজো ছেলের বউ-এর মত। ছেলেদের পাপের স্কুলে ছোটবেলা থেকেই ভর্তি করে দেয়। সাফল্যের লাল আপেল যে ভাবেই হোক্ যোগাড় করলে দারুণ খুশি হয়ে যায়। কোনো প্রশ্ন করে না। বাসের যাত্রীদেরও কি ওই বয়সের ছেলে ভাইপো ভাগনে আছে! তাই এই চুপচাপ সহানুভূতির সমর্থন? অলকের শহীদ বেদীর ওপর নির্মমভাবে ফুটবলটা পড়ছিল। তার ধপ্‌ধপ্‌ শব্দ রবির মাথার ভিতর ক্রমাগত বাজছে। কার জন্যে অলক মরল? কি করেছিল অলক?

অলক কবিতা লিখত। একটু-আধটু ছবি-টবি আঁকত। হয়ত কোনো একটা রাজনৈতিক বিশ্বাসও তার ছিল। কিন্তু সে তো কোনোদিন সেভাবে রাজনীতি করেনি। একথা রবি কাকে বিশ্বাস করাবে? তাছাড়া কলকাতা শহরই এমনি। সব কিছু বড়

তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। ওই ছোট ছোট ছেলেগুলো যেমন ভুলে গেছে।

কদমগাছটার তলায় ওটা কী? ওটা কেন?

কতজন তারা? কত তরুণ? সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন একটা বিরাট দাবাখেলার ছকের মত মনে হ'ল ববিব। যারা খেলুড়ে তাদেব মুখ কখনোই স্পষ্ট দেখা যায় না। কেবল এখানে ওখানে দমে উঠতে থাকে পাকা মাথাব চালে কাটা-পড়া বোড়েগুলো। বাবব ইচ্ছে হলো সারা কলকাতা ঘুবে ঘুবে সে এই সব উলুখড়দেব ভুলে যাওয়া স্মৃতিব পাথব গুণে গুণে দেখবে।

৪

রূপুকে মুন্নীর টিয়ে পাখির গল্প বলছিল রবি। গল্পটা খানিকটা রবির বানানো। রথের মেলা থেকে মুন্নী বলে একটা মেয়ে একটা টিয়াপাখি কিনে এনেছিল। রাতে সেই টিয়াপাখি রোজ মুন্নীকে ধানখেতের গল্প শোনাতো। শেষ পর্যন্ত মুন্নী, তার বাবা-মাকে টিয়াপাখির কথা বুঝিয়ে বুঝিয়ে কেমন শহর ছেড়ে গাঁয়ে চলে গেল। নিজেদের ভিটে খেতীতে। গল্পটা শুনে রূপু খুব খুশি। সে টিয়াপাখি ছবিতে দেখেছে। সত্যিকার টিয়া দেখেনি। রবি বলল—তুই কত টিয়ে দেখবি রূপু বল? পার্কের শেষে রেল লাইনের পারে ধানখেতে কত টিয়া নামে! শুধু কি টিয়া, ইষ্টি-কুটুম, হলুদ-বসন্ত, লেজঝোলা, বুলবুলি, শালিক, ঘুঘু, মাছরাঙা কতরকম পাখি, শাদা শাদা বক, কাদাখোঁচা নালার জলের ধারে ঘোরে···দেখবি তো চল্!

রূপু সঙ্গে সঙ্গে চটি গলিয়ে তৈরী। সাত বছরের নরম ছোট্ট মেয়েটি। মাসি মেসো রবি সায়নের বড্ড আদরের।

এখন রূপু পাখি দেখতে দেখতে পার্কেই জমে গেছে। আর যেতে চায় না। পাখি দেখতে দেখতে, গাছ ফুল আকাশ জল এইসব ব্যাপারের ফাঁদে পড়ে গেছে। এখন সে টগর গাছের তলায় মাটির ওপর দিয়ে পিঁপড়েদের চলা দেখছে। রবি নজর রাখছিল।

চারিদিকে একটা হেমলিনের বাঁশিঅলার মত বিকেল। মোহের মত বিকেল। হলদে শিমুল তুলোর ফেঁসোর মত মেঘের ফাঁক দিয়ে কাঁচা হলুদ একটা আলোর ঢল নেমে পার্কটাকে একটা জাদুরাজ্য করে দিয়েছে। এখন এখানে যেন সবই ঘটতে পারে। জলে নামলে

যেমন আদুড় গায়ে জল লাগার একটা শিরশিরোনি উঠতে থাকে, এই জাদুরাজ্যের আলোর ঢলেও তেমনি রবির গা শিরশির করে উঠছিল। হাওয়ার ঝলকগুলো কেটে কেটে বসছিল আরো খানিকটা ভিতর। রবির মাথার ওপর সুন্দর পরীটি হয়ে ছাউনি করে আছে। একটা বাঁদরলাঠি গাছ। কালো কালো লম্বা লম্বা বাঁদরলাঠিগুলো ঝুলছে জাদুদণ্ডের মত। পাতার সবুজ রঙটা আশপাশের গাছের সবুজ রঙের চেয়ে অল্প হাল্কা। সামান্য রোদ্দুর মেশানো। আর ঝুলছে ঝাড়লণ্ঠনের মত হলদে হলদে ফুল। সরু ডাঁটের দুপাশ থেকে আরো সরু ডাঁটি বেরিয়ে বেরিয়ে তার মাথায় একটি করে বাসন্তী রঙের বলের মত। রবি দেখছিল। তার চারপাশে লম্বা লম্বা নধর দূর্বার গায়ে গায়ে ছিটিয়ে আছে ঝরা হলুদ পাপড়ি। পাশেই পাউডার পাফের মত লালচে ফুলে ভর্তি শিরিষ, শাদা টগর আর লাল রঙ্গন। ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে মাটিতে বুক বাইছে সরু সরু লতার জাল। গাঁটে গাঁটে ছোট্ট ছোট্ট পাতা। লাল নীল নাক-ছাবির পাথরের মত গুঁড়ো গুঁড়ো ফুল।

এত রূপের ভেতর এভাবে একা ভাসা যায় না। মন সঙ্গী চায়। মাঝে মাঝে স্বপ্নের ভিতর নিজের পঞ্চেন্দ্রিয় যেমন নিজের সঙ্গেই অসহযোগ শুরু করে দেয় এখন এই প্রখর জেগে থাকার মধ্যেও রবি তেমনি অসহায়। সমস্ত পার্কটা তার গাছপালা জল নিয়ে যেন বিশাল একটা সমুদ্রের মাংসাশী ফুলের মত ফুটে উঠেছে। রবি যেন সেটার আওতায় ক্রমশ ক্রমশ চলে যাচ্ছে।

একটু দূরে তেরছা দেখা যায় চারপাশে বাঁধানো রাস্তার মাঝখানে যেন এক অতিকায় ফুলদানির মত গোল জায়গায় শ্বেতকরবী আর রক্তকরবীর ঝাড়। গাছের পাশ থেকে আবছা গলার আওয়াজ পেল রবি। রূপু আর একটি মেয়েলী গলা।

—আচ্ছা, বলো তো ওই পাখিটা কি ?

—শালিক।

—ওই যে,—ওই গাছটাতে—

—লেজঝোলা।

—আর ওই! ওই উঁচু ডালটায়?

—ডানায় কত রঙ, তাই না? নাম জানি না।

—মাছরাঙা।

—নামটা মোটেই ভালো না!

ঝোপটা ঘুরে বাঁধানো পথ ধরে এগিয়ে আসছে দুজন। এবার রবি দেখতে পাচ্ছে। সেই মেয়েটি। রবি যাকে রোজ দেখে। আর যে কোনো দিনই রবিকে লক্ষ্যই করে না, সে। কলকাতায় কলেজে পড়তে যায় মেয়েটি। সকালে দাদু যখন পার্কে চর্কিপাক দেয়, ও তখন নিচু হয়ে এক মনে বই পড়ে বেঞ্চিতে বসে বসে। রূপুর হাত ধরে কাছে এগিয়ে আসছে মেয়েটি।

রবি তো রোজই মেয়েটিকে দেখে। প্যাকেটে মোড়া বিলিতি পুতুলের মত খুব নাগালের বাইরে, খুব দামী মনে হয় তার। আজ সে আর মেয়েটিব দিকে তাকাতে পারছিল না। পিছনে রোদ্দুর থাকায় নয়নসুকের ফুলকাটা বাসন্তী রঙের ছাপাশাড়ির মোড়কে তার সতেরো-আঠারো বছরের তনুদেহর নরম রেখাগুলি হাল্‌কা হাল্‌কা ফুটে আছে। মেয়েটি কথা বলার জন্য মুখ নাড়তেই তার কানেব রিঙে চমকানো দুটি টল্‌টলে সোনালী বিন্দু দুলে উঠল।

—রূপু তো অনেকদূর চলে গিয়েছিল। পাখি আর ফুল দেখতে দেখতে, সেই রেললাইনের ধারে!

অন্যদিন হলে রবি হয়ত একটু আড়ষ্ট হতো। একটু বা পোশাকী। কিন্তু আজ যেন অদ্ভুত, অন্যরকম। মেয়েটির কপালে পড়া হিজিবিজি চুলের দিকে তাকিয়ে সে পাশে হাত দেখিয়ে বলল —আসুন! এখানে!

একটু দূরত্ব রেখে রবির মুখোমুখিই বসল মেয়েটি। রূপু বসল

রবির কোল ঘেঁষে। তার ফ্রকের কোঁচড়ভরা নানা রঙের ফুলের পাপড়ি। মেয়েটির কণ্ঠস্বর হাল্কা। বয়সের চেয়েও কিশোরী।

—রূপু আপনার ছোট বোন বুঝি!

—হ্যাঁ, ছোট মাসির মেয়ে!

—চেহারায় কিন্তু মিল আছে!

ববি মনে মনে হাসল। মেয়েটি বুঝতে পারেনি রবি বাদামতলা লেনের এক গরীব সর্টারের বেকার ছেলে।

—খুব পাখি ভালোবাসে! ওকে ভোরবেলায় যখন বেড়াতে আসেন তখন আনেন না কেন? তখন কত্ত রকম পাখি আসে!

ববি হেসে বলল—আপনি তো মাথা নিচু কবে বই পড়েন। পাখি দেখেন কি কবে?

—পাখি দেখি, আপনাদেব দেখি, আবাব বইও পড়ি, হাসল মেয়েটি।

ববিব ইচ্ছে কবল মেয়েটির কাছে জানতে চায় কত ভোরে ওঠে মেয়েটি। যখন আকাশে শুকতাবা টলটল করতে থাকে, তখন সে কি কবে? ববিব মত একা একা শুয়ে থাকে? ভাবে? সেকি ভোরেব সেই প্রথম পাখির ঝাঁকেব অনেক ওপর দিয়ে চলে যাওয়ার শব্দ শোনে? উত্তর থেকে দক্ষিণে। সেই পিস্টন আর হুইস্‌লের মিলিত আওয়াজ?

ববি দেখল ঘাসেব ওপর মেয়েটির আঙুলগুলি পড়ে আছে। নরম আর ঢেউ খেলানো। গেরুয়া সিল্কের মত রঙ। মেয়েদের হাতের আঙুল এর আগে রবি আর কখনো এমন কবে লক্ষ্য করেনি। চিন্ময়র নেল পালিশ লাগানো নখওয়ালা আঙুল···আলোর?··· কেমন? রবি লক্ষ্য করেনি। মনে মনে হাসল রবি। মেয়েটির সম্বন্ধে এত কিছু ভাবছে। অথচ এখন পর্যন্ত মেয়েটির নামটাও তার জানা হয়নি।

—আপনি কোন্ দিকে থাকেন?

—বৈজয়ন্তী আবাসে।

রবিদের বাড়ি থেকে মাঠ পেরিয়ে দূরে ওই ওন-ইয়োর-ওন-ফ্ল্যাটের সারিগুলো দেখা যায় পাহাড়শ্রেণীর মত। ঝিক্‌মিক্ করে আলো জ্বলে।

রবি বলল, আমার নাম নিশ্চয়ই রূপুর মুখে শুনেছেন, আপনার নাম কিন্তু জানা হয়নি।

মেয়েটি হাসল।—আমার নাম খুব বাহারে। দাদুর দেওয়া কিনা! দাদু একটু পাগল আছেন। খুব বইটই পড়েন তো। রোজকার আটপৌরে ডাক দেবার সময় ওই নাম চলে না। বাড়িতে সবাই আমাকে মন্টি বলে ডাকে। ভালো নামটা বড্ড পোশাকী আর অচল।

—অচল নামটাই শুনি না!

—'মধুরা'।

রবি কখনো এমন নাম শোনেনি। সে হেসে বলল—আমি কিন্তু ওই অচল নামটাই চালিয়ে দেব ভাবছি!

মধুরা বলল—আপনাকে রোজ সকালবেলা দেখি। বাব্বা কতসব রঙ্‌বেরঙের জামা যে পরেন! আপনি বুঝি খুব সাজ-পোশাক করতে ভালোবাসেন?

রবির মধুরার কাছে কোনোরকম মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। সে বলল,—ওর একটাও আমার জামাকাপড় নয়। সব ছোটমেসোর।

মধুরা অন্যদিকে চেয়ে একটু হাসল। রবির কথা বোধহয় বিশ্বাস করল না।

—আপনি কি পড়াশুনো করেন? মাঝে মাঝে যে কলকাতায় যেতে দেখি!

—এখন কিছু করি না। অনেকদিন হাসপাতালে ছিলাম। এখন আছি ছোটমাসির কাছে। বলতে পারেন ওয়েটিং রুমে। একেবারে ঘরেও নাহি, ঘাটেও নাহি এই অবস্থায়।

মধুরা রবির কথার ধরনে হেসে উঠল। তারপর অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। রূপু পাশে বসে বসে ফুল ছড়িয়ে খেলা করছিল। ওরা দুজনেই কখনো সেদিকে, কখনো পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল।

হঠাৎ শোরগোল উঠল করবীর ঝোপের ওপাশে। একটি কৃষ্ণ-চূড়ার পাতাঝরা কালো শরীরে শুধু লাল লাল পুষ্প স্তবক। তারই ডাল নুইয়ে ধরেছে একদল। আর একদল ডাল সমেত ফুল ছিঁড়তে চেষ্টা করছে। কখনো কখনো হাত ফস্‌কে ছিলে ছাড়া ধনুকের মত উঠে যাচ্ছে ডালগুলো। কখনো কখনো ভেঙে পড়ছে। ঘাসের ওপর জমা হচ্ছে ফুলের গুচ্ছ। আব তাব চারপাশ ঘিরে নাচছে কয়েকজন তরুণ-তরুণী চিৎকার করতে করতে। রূপু উঠে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তার চোখের দৃষ্টি উৎকণ্ঠায় বদলে গেছে। খানিকদূব এগিয়ে গিয়ে সব দেখে এসে সে আর্ত চাপা গলায় বলল, ববিদা, ছাখো, ছাখো, ওরা সবাই ডাল ভাঙছে, ফুল ছিঁড়ছে !

রবি আর মধুরা দৃষ্টি বিনিময় করল।

কয়েকটি তরুণ-তরুণীকে দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে কয়েকটি অল্পবয়সী বালক-বালিকা। কিছুক্ষণ পরে ওদের পাশ দিয়েই চলে গেল তারা। উল্লাসে, হাসিগল্পে মশগুল। কয়েকজনের হাতে ভাঙা কালো ডালে লাল কৃষ্ণচূড়া।

—এদের মুখ তো চেনা লাগল না, মধুরা বলল।

—এরা এখানকার না। হয়ত কলকাতার। আজকাল অনেকে আসে। খালি প্লট দেখতে, ওপাশে যে সব ফ্ল্যাট-ট্যাট উঠছে সেগুলো দেখতে। ওরা বোধহয় সেই দলের। এখন ফিরে যাবে। এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টার রাস্তা। বাসে ট্যাক্সিতে, গরমের আঁচে চাপে ছিঁড়ে যাবে, ফুল ঝরে যাবে, পিষে যাবে। যেটুকু বাড়িতে পৌঁছোবে সেটুকুও তেমন সুন্দর থাকবে না আর ! রূপু বলল,—তাহলে ওরা ফুল ছিঁড়ল কেন শুধু শুধু ? ওই একটুখানির জন্যে ! ছিঁড়ল কেন ?

মধুরা বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন! ওরা এখানকার কেউ না। ওরা অন্য কোথাওকার। হয়ত কলকাতার।

রবি বলল, কি করবে বলুন ওরা। কলকাতার তলায় তো কোনো বত্রিশ সিংহাসন নেই!

মধুরা বলল, কি বললেন, বত্রিশ সিংহাসন? রবি মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল।

—আপনি কি আগে কখনও কলকাতায় ছিলেন?

—ছিলাম!

—কতদিন হলো এসেছেন এখানে?

—মাস ছয়েক!

—কলকাতায় কোথায় থাকতেন আপনারা?

—বেলেঘাটায়। একটা ঝরঝরে পুরোনো বাড়ির তিনতলায়। খুব সরু গলি। আমাদের অনেক শরিক। অনেক দায় ধাক্কা। কোনো শরিকই কর্পোরেশনের ট্যাক্স দিত না। শেষ পর্যন্ত বাড়িটা নিলামে চড়ল। তাই দাদুর জমানো টাকা, বাবার পেন্সন, গ্র্যাচুইটি মিলিয়ে এই ফ্ল্যাট কেনা হলো।

—তাহলে তো আপনি সব বুঝবেন!

—কি বুঝবো?

—আপনি কখনো ফুল ছেঁড়েননি।

—না, আমি ছিঁড়তে সুযোগ পাইনি। কিন্তু খুব ইচ্ছে করত ছিঁড়তে। বারান্দা থেকে যখন দেখতাম বাড়ির সামনের রোগা ধুলোপড়া একটা কাঞ্চন ফুলের বেগুনী রঙের ফুলেভরা গাছকে যখন পাড়ার ছেলেমেয়েরা খুবলে নিত, টেনে টেনে ছিঁড়ত, তখন আমারও ইচ্ছে করত ছুটে যাই। ফুলগুলোকে দলে দিই। সহ্য হত না। সত্যি! ঠিক বলেছেন। মনে হত এই গলিতে ওই বেওয়ারিশ সুন্দর গাছটা সকলের নিসপিসে হাতের নাগালে থাকবেই বা কেন? ইস্‌স্‌

—আর ছোট ছোট কুকুরছানা, বেড়ালছানা !

—হ্যাঁ, তাও ! গলায় পাড় বেঁধে কত টানত কত মরে পড়ে থাকত ডাস্টবিনের পাশে !

—আমি কি বলতে চাইছি, আপনি ঠিক বুঝবেন !

—বত্রিশ সিংহাসন…বত্রিশ সিংহাসন।

মধুরা আওড়াল নিজের মনে মনে ! কলকাতার তলায় তো বত্রিশ সিংহাসন নেই…হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। আমাদের স্কুলে পড়তে হত। সিস্টার নিবেদিতার লেখা গল্প। 'জাজ্‌মেণ্ট্‌ সীট্‌ অফ বিক্রমাদিত্য।' সেই ক্ষেত্রপালের গল্প। রুদ্ধ গলায় রবি বলেছিল,

—তাই তো বলছিলাম, আপনি ঠিক বুঝবেন। কিন্তু রূপু বুঝবে না। ও তো দুটো দিক দেখেনি। ওরা ভাবে ফুল না ছেঁড়াটাই স্বাভাবিক।

—আর আমরা ভাবি এটাই বুঝি স্বর্গ !

হঠাৎ মধুরা উঠে দাঁড়াল।—মাস্টারমশাই না !

মধুরার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে রবি দূরে তাকালো। গেরুয়া পাঞ্জাবি-পরা একটি যুবক ইতস্তত তাকিয়ে খুঁজছে কাউকে।

—উনি বুঝি আপনাকে পড়ান !

মধুরা রবির দিকে তাকাল। তার চোখের দৃষ্টি অস্থির অন্য-মনস্ক।

—না, পড়ান না। আগে পড়াতেন।

—ও, ছোট করে বলল রবি।

মধুরা উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে এগোল।—মাস্টারমশাই-এর আসলে আমাদের বাড়িতে যাওয়া বারণ। রবি আবার ছোট্ট করে বলল, ও। তারপর রূপুর হাত ধরে সেও উঠে পড়ল। দুভাগ হয়ে যাওয়া রাস্তার একদিক দিয়ে সেই গোধূলির রঙিন ধূসরতায় আবছা মানুষটির দিকে এগোতে এগোতে মধুরা আবার বলল,—মাস্টারমশাই কলকাতা থেকে কেন যে এত কষ্ট করে বার বার আসেন।

রবি কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে অন্য রাস্তা ধরে এগোল। অপরাহ্নের লাল রঙ আস্তে আস্তে কালশিটের ছড়ার মত কালো হয়ে আসছিল মেঘের গায়ে গায়ে। সেদিকে তাকিয়ে রবির হঠাৎ সুজাতাদির কথা মনে পড়ল। সুজাতাদি মানেই মাথার চুলে ঠাণ্ডা সেবার ছোঁয়া। ক্ষতের জ্বালার পাশে মলমের দুঃখহারী প্রলেপ।

রূপু তখনই রবিকে মনে করিয়ে দিল, বলল—পাখি দেখতে দেখতে তোমার খেয়াল নেই রবিদা! মা না বলে দিয়েছিল তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে!

সঙ্গে সঙ্গে রবি আর রূপু হাঁটার গতি বাড়াল। কারণ রবি জানে ছোটমাসির তাড়াতাড়ি আসতে বলার অর্থটা কি।

দূর থেকে দেখতে পেল রবি, ছোটমাসি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দা থেকে শরীরের ওপরটা অর্ধেক বাঁকানো। ওরা একটু কাছে যেতেই বারান্দা থেকেই চেঁচিয়ে বলল ছোটমাসি,—তুই কি রে রবি, এত দেরি করতে হয় কখনো?

রবি অপরাধীর মত হাসল। আজকাল ছোটমাসিকে নানা রকম বাতিকে ধরেছে। কিছু বলার নেই। রবি, ছোটমেসো সায়ন স্বয়ং ডাক্তারবাবু সবাই এলে গেছে। ছোটমাসিকে তাই যা ইচ্ছে বলে যেতে দেয়। ছোটমাসি ওপর থেকে নেমে এসে ড্রইংরুমে আগ বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবি আর রূপুকে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে রূপুকে কোলের কাছে টেনে নিল।

—আমি যে তোদের দেরি দেখে কত কিছু আবোলতাবোল ভাবছি। রূপুটা পুকুরে ডুবে গেল কি না! তুই গাড়িটাড়ি চাপা পড়লি কি না!

রবি একবার ছোটমাসির দিকে তাকাল। ছোটমাসির চোখের চারপাশের দুশ্চিন্তার রিঙ, কাঁপা কাঁপা হাত অস্থির কথা বলার ভঙ্গি দেখে রবি বুঝতে পারল ছোটমাসি কোনোরকম ভড়ং করছে না। তাই সে শুধু ফিকে অস্পষ্ট গলায় বলল,—কি যে বলো!

—'তুই জানিস না রবি,' গ্রামোফোনের পিনে আটকানো ছোটমাসির সেই একটিই কথা হাজার বার শুনতে হয় তাদের। 'আমার আজকাল বড় ভয় করে। চারদিকে যা সব ঘটছে!'

ছোটমাসি রূপুর চুলের ভিতর দিয়ে কাঁপা কাঁপা আঙুল চালাচ্ছিল। রবি ছোটমাসিকে লক্ষ্য করছিল। ভারী সুখী সুখী নরম চেহারা। ফর্সা দোহাঁরা গড়ন। তার মায়ের মত টানা ছাঁদের নাক চোখ মুখ নয়। ময়লা রঙ-ও না। রবির দিদিমা নাকি পুতুল পুতুল দেখতে ছিল। এমনি চেহারা বলেই একদিন ট্রেনে না কোথায় ছোটমাসিকে দেখে ছোটমেসোর মায়ের পছন্দ হয়ে যায়। ছোটমেসো তখন কাস্টম্‌সে চাকরি করত। রবির দাদু দিদিমারা তো ধনী ছিল না। রবির মা তো সটারের ঘর করছে। কাস্টম্‌স অফিসের চাকুরে আর কি এমন মন্দ পাত্র?

এ সব গল্প ছোটমাসির কাছেই শোনা। মামার বাড়ি কি বস্তু তা রবি কখনো দেখেনি। মা কখনো মামার বাড়ির নামও করত না। বাবার তো তিন কুলে কেউ ছিলই না শুনেছিল রবি। বাবা এসেছিল ঝাড়া-হাত-পা, পূর্বপাকিস্তান থেকে।

ছোটমাসি ছোটমেসোর সঙ্গে যোগাযোগ হলো রবির অ্যাকসিডেন্টে পর। হাসপাতালের ওয়ার্ডে। ছোটমাসিদের ড্রাইভার এক গরীব মুসলমান বুড়োকে গাড়ির ধাক্কা মেরেছিল। সেই বুড়োকে দেখতে এসেছিল ছোটমাসি। রবির মা ছোটবোনকে চিনতে পেরে চেনা দিয়েছিল।

ছোটমাসি তার গাঢ় কালিপড়া চোখ তুলে রবির দিকে তাকাল। কি ভেবে একটু কেঁপে উঠলও যেন। সেই অদ্ভুত ফ্যালফ্যালে চোখের দিকে তাকিয়ে রবি তাড়াতাড়ি ভয়ের একটা ক্রমশ গড়ে উঠতে থাকা আবরণ ভেঙে দিয়েই যেন মুখস্থর মত বলে উঠল—কি ছোটমাসি তুমি রূপুর জামা করাতে বেরোবে বলছিলে না?

—নাঃ, ভালো লাগছে না। কি হবে এ সব করে? জামা

জুতো গয়না কাপড়? মাথা তুলে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল ছোটমাসি—এই ঘর, এই আসবাবপত্তর?

রবি কিছু বলল না। সে বুঝতে পারল ছোটমাসি আবার কারো কোনো বিপদের কথা শুনেছে। সে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বাগানের দিকের জানলায় দাঁড়ালো। জানলার গ্রীল ছুঁয়ে চীনে মল্লিকার সবুজ লতাটা একটা থোপা এগিয়ে দিয়েছে। গন্ধে ম' ম' করছে জায়গাটা। হঠাৎ একটি ছোট্ট নাম মনে পড়ে গেল রবির। মধুরা। অপরাহ্ণের রঙিন আলোছায়ার মধ্যে দিয়ে সে গেরুয়া পাঞ্জাবি-পরা একটি সুছাঁদ যুবকের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। অন্যমনস্ক।

ছোটমাসির গলার আওয়াজে রবি ঘরের দিকে ফিরল। যোগিয়া চায়ের সরঞ্জাম এনে রেখেছে। সেল থেকে কেনা বিলেতি পোর্সিলিনের দামী টি সেট। অল্প হলদে হয়ে আসা ডিমের খোলার মত পাৎলা টি-পট কাপ ডিশ। সোনালী চিক্‌রি-কাটা। কেৎলির গায়ে একটু ময়লা ছোপ দেখে রাগে চিৎকার করে উঠল ছোটমাসি।

—আচ্ছা! তোরা কি করিস বলত যোগিয়া? সারাটা দিন? খালি খাস আর ঘুমোস? বাসন ধোয়ার লোকটাকে একটু বলতে পারিস না বাসনে এত ময়লা থাকলে চলবে না?—এই যে ঘরটা, এর মধ্যে সিলিঙে ঝুল, স্ট্যাচুটায় ধুলোর আস্তর পড়েছে। ছবির কাচগুলো কতদিন মোছা হয় না। অথচ তোকে তো ঝাড়ামোছা ফাই-ফরমাশ খাটার জন্যেই এতগুলো টাকা দিয়ে রাখা!

মাথা নিচু করে পালিয়ে বকুনি এড়াল যোগিয়া।

ছোটমাসির সামনের চেয়ারে বসল রবি। ছোটমাসি চা ঢালছিল। চা ঢালতে ঢালতে বলল—সত্যি কথা বলতে কি দোষটা আসলে আমারই। ওদের শুধু শুধুই বকি। আমারই কেমন যেন মন উঠে গেছে। ওদের বকে কি হবে? আজকাল আমার আর কিছু ভালো লাগে না। বুঝলি রবি। মনে হয় এ সব করে কোনো

লাভ নেই। আসলে আমিই আর লোকজনকে দিয়ে কাজকর্ম করিয়ে নিতে পারি না। সব সময় কেমন যেন ভয় ভয় করে।

রবি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলল—সত্যি মাসি তুমি এত বলো, আমি কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারি না কিসের ভয় তোমার ?

—ভয় নেই ! দেখতেই তো পাচ্ছিস চাদ্দিকে, আশেপাশে কত বিপদ। কোনো রকমে যেন দৈবাৎ আমাদের এই সংসারটা বেঁচে বেঁচে যাচ্ছে !

—যেন না বাঁচাব কোনো কথা ছিল ! যাও তো, না ভেবে, এবার রূপুকে নিয়ে একটু বেবিয়ে পড়।

ছোটমাসি যখন রূপুকে নিয়ে ওপরেব ঘরে তৈরি হতে গেল, নিচের তলার ছোট বসার ঘর থেকে বেরিয়ে এল ছোটমেসো। রবি অবাক হয়ে দেখল ছোটমেসোও ছোটমাসিব মত অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিব দিকে। মনে মনে প্রমাদ গুণল রবি। ব্যাপাব কি ?

ফ্যাঁশফ্যাঁশে গলায় মেসো বলল, তুমি কি ওদেব সঙ্গে বেরুচ্ছ রবি ?

—না।

—তবে আমার ঘরে এস। কথা আছে !

রবি পর্দা সরিয়ে ছোটমেসোর পেছন পেছন তার ঘরে ঢুকল। মাঝে মাঝে রবি এ ঘরে ফোন করতে ঢোকে। ঢুকলেই ঘরটার চাপা পর্দাটানা আধো অন্ধকারে সিগারেটের ঘন গন্ধে অদ্ভুত গলা চেপে ধরে। সিলিঙ থেকে এক গুচ্ছ আলোর বল ঝুলছিল। তার একটি মাত্রই জ্বালা আছে। এ ঘরে রাত দিনই একটা আলো এভাবেই কারণে অকারণে জ্বালা থাকে। কারণ ছোটমেসো ক্বচিৎ কখনো জানলাগুলো খুলে দেয়।

একটা গড়ানে চেয়ারে বসে, নিচু মোড়ার ওপর পা তুলে দিয়ে

মেসো বসল। ছোটমেসোকে যেদিন প্রথম দেখেছিল রবি সেদিন থেকেই তার একটা ফুটো করে পাকা আমের রস চুষে নেওয়ার উপমার কথা মনে পড়ত। এখনও তাই পড়ছে। পাশের রাইটিং টেবিলে রাখা ছোটমেসোর দশবছর আগেকার ফটোটার সঙ্গে বলতে গেলে ছোটমেসোর কোনো মিলই নেই।

ছোটমেসো বলল—আজ ড্রয়ার ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা পুরোনো হিসেবের নোটবুক খুঁজে পেলাম। বেশ মজা লাগছিল নোটবইটা উলটে পালটে দেখতে।

ছোটমেসো এমনিই। তুজনের মধ্যে খুব কম কথা হয়। কথা হলেই ছোটমেসো কিছুটা এলোমেলো কথা বলতে বলতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনার বিষয়ে চলে যায়। রবির বেশ লাগে। কখনো ছোটবেলার গাঁয়ের কোনো মেলা, কখনও কলকাতার গলিতে ক্রিকেট খেলা, কখনো সিমলা পাহাড়ের একলা একলা বেড়িয়ে বেড়ানোর গল্প।

—তোমার ছোটমাসির সঙ্গে বিয়ের বছরখানেক বাদে অফিসের স্টেশনারির কিছু কাগজ নিয়ে এই ছোট্ট লম্বা সাইজের নোটবইটা নিজেই বেঁধে নিয়েছিলাম। দেখো নোটবই-এর পেট ঠাসা কত কাগজ। কাটিং এখনও রয়েছে। দেখছিলাম!

রবি ঠিক ছোটমেসোর সামনে বসে ছিল। মাথার ওপরে নিঃশব্দ পাখা। এটাও বোধকরি ওই আলোর মত। আপন মনে তু-পয়েণ্টে ঘুরে যায়। ঘরে মানুষজন থাকুক আর না থাকুক।

—আমরা তখন থাকতাম বাগবাজারে। এক জাঁদরেল বাড়ি-অলার বাড়ির পেছন দিকের তুখানা ঘর নিয়ে। একটা ঘরে থাকত মা আর আমার ছোট ভাই। বাবা সত্ত মারা গেছে। আর এক ঘরে আমি আর তোমার ছোটমাসি। মা আর ভাই থাকত একটু ভদ্রগোছের ঘরটায়। আমরা থাকতাম চাপা একটি মাত্র জানলাঅলা একটা ড্যাম্প অন্ধকার ঘরে। তোমার ছোটমাসিই ওটা বেছে

নিয়েছিল। নীপু তখন কত গুছুনে ছিল। সত্যি অবাক হয়ে ভাবি। সেই ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে এমনকি ভাঁড়ারটি পর্যন্ত গুছিয়ে রাখতো নীপু। সেই সময় আমরা দুজন ওই নোটবইটায় যার যেটা মনে ধরত লিখে রাখতাম, খবরের কাগজ থেকে কাটিং করে রাখতাম। পাখা, কুকার, ফার্নিচার, আরো কত কি! সত্যি সে একটা সময় গিয়েছে বটে। আমাদের খাটটা ছিল পুবের একমাত্র জানলার তলায়। খাটে বসে জানলা দিয়ে একটা ছোট সিঁটকে বকুলগাছ দেখতাম আমরা। মনে হত সেটাই বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো দৃশ্য। এখনও—

ছোটমেসো হাত বাড়িয়ে সিগারেটের বাক্স খুলল। টেবিলের ওপর রাখা বাহারে বাক্সটা খুললে বাজনা বাজতে থাকে আর এক-জোড়া সাহেব মেম পুতুল বেরিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। ছোটমেসোর এইসব বিদেশী টুকিটাকি শখের জিনিস সম্বন্ধে অদ্ভুত দুর্বলতা আছে। লম্বা সরু একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে ফেলল ছোটমেসো।

—কত সব ছোটখাটো সাধ!

আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ছিল ছোটমেসো। ঘরের বদ্ধতার জন্যে ধোঁয়ার রাশ হঠাৎ করে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল না। নানারকম প্যাটার্ন তৈরি করতে করতে উধাও হয়ে যাচ্ছিল।

—আমাদের বিয়ের বছরখানেক বাদে মা ভাই-এর সঙ্গে দুর্গা-পুর চলে গেল। ভাই ওখানেই চাকরি করে। আমরা ঠিক করেছিলাম মা ভাই চলে গেলেও ওই ঘরটা আমরা রাখব। একটা আস্ত ঘর পাওয়া, ঘর নেওয়া তারপর সেই ঘর মনের মত করে সাজানো-গুছোনোর জন্যে কত অঙ্ক, কত হিসেব, কোন দিক থেকে টেনে বাঁচাব সেই ভাবনা। আজ উল্টে পাল্টে দেখছিলাম। সেই সব ছোটখাটো লিস্ট।

রবি ছোটমেসোর হাত থেকে নোটবইটা টেনে নিল। হাতের

কাছে লাইট স্যুইচের সুদৃশ্য ঝোলানো ঝোলানো তার। আর একটা আলোর 'বল' জ্বালিয়ে দিল ছোটমেসো। রবির মাথার ওপরটা আলোকিত হ'ল। প্রথম দিকের তু-চারটে পাতা উল্টে রবি দেখল কুটি কুটি করে এক পয়সা পর্যন্ত বাঁচানোর হিসেব লেখা আছে। জলখাবারের খরচ ছেঁটে দেওয়া হয়েছে, রাতের রান্নার জন্যে উন্নুন জ্বালানো হচ্ছে না।

—কিন্তু জানো রবি, সে সময় এত কবেও ঘরটা শেষ পর্যন্ত নেওয়া যায়নি। হঠাৎ জানা গেল সায়ন আসছে। ডেলিভারির জন্যে টাকা জমাতে হবে।

ছোটমেসো উঠে দাঁড়াল। চুলে এখন পরিষ্কার নতুন কলপ। বাঁধানো দাঁতের জন্য গালের পেশি কি রকম অদ্ভুত পলিত! দাঁতগুলোকে জ্যোতিহীন খস্‌খসে সাদা লাগতে থাকে।

ঘবের কোণে ছোটমেসোর নিজস্ব মিনিফ্রিজ্। ফ্রিজ খুলে টেবিল থেকে ক্যাপসুলের শিশি বের করে তুটো ট্যাবলেট খেলো ছোটমেসো, বোতলের ঠাণ্ডাজলে গিলে গিলে।

রবি আর একবাব ছোটমেসোর ছবিটার দিকে তাকাল। পুরোনো ধরনের শার্টপরা। ছবিটা রাখতে গেলে শার্টটাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না। রবি বলল—এটা সেই সময়কার ফটো, না?

ছোটমেসো ছবিটাকে বেশ লক্ষ্য করে দেখল।

বাইরে রূপু আর ছোটমাসির কথাবার্তার আওয়াজ। ভারি পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ালো ছোটমাসি। রবি দেখল আকারে তফাত হলেও প্রকারে অবিকল তুটো মুখ তুজনের দিকে তাকাচ্ছে। ছোট-মাসি আব ছোটমেসো অমনিই। অনেক লোকের মাঝখানেও তুজনে এমনভাবে তুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে যেন মনে হয় চোখে চোখে সঙ্কেতে কথা বলছে। সব সময়েই যে ভালোবাসার কথা বলছে তা নয়। মনে হয় অন্য কথা। নানান কথা। নানান

বোঝাপড়া, নানান গোপন ব্যাপার। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস সন্তর্পণে চাপল রবি। ঠিক তার বাবা-মায়ের উল্টো। তার বাবা-মা যখন ক্রমাগত বক্‌বক্ করে যায়, তখনো কিন্তু রবির মনে হয় না যে পরস্পরের মধ্যে, আদৌ কোনো কথাবার্তা হচ্ছে।

—আমি রূপুর ফ্রকের অর্ডার দিতে কলকাতায় যাচ্ছি। তোমাদের কারো কিছু আনতে হবে?

—না।

—পিনাকীবাবু আর ফোন করেছিল?

—হুঁ!

—ওদিকের খবর কিছু পেলে?

রবির দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নিয়ে, ছোটমেসো বলল—না!

ছোটমাসি চলে যাবার পব রবি বলল—ছোটমাসির সম্বন্ধে ডাক্তার কি বলছে এখন? অমনি আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাব!

—ও বড় ভয় পায়!

—কেন? ভয়ের কি আছে?

—সকলেরই কি আর সব ব্যাপারে এক রকম রি-একশন। আসলে ও হয়ত একা থাকতে থাকতে খানিকটা শক্-ই পেয়েছিল।

ছোটমেসো চেয়ারে এলিয়ে বসল।

—তখন আমি সবে চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা ধরেছি। আমাকে খুব বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হত। তোমার ছোটমাসি তখন সায়নকে নিয়ে একলা একলা ওই বাগবাজারে থাকত। পাড়াটা নেহাতই ঘরোয়া পাড়া। বাড়িগুলোও গায়ে গায়ে। এ বাড়ির সঙ্গে ও বাড়ির গলাগলি। দেওয়া নেওয়া। যেমন হয়, লোয়ার মিড্‌লক্লাস পাড়ায়। হাত উল্টো করে বোঝাতে চাইল ছোটমেসো। সামনের বাড়িতেই থাকতো ছোট একটা ফ্যামিলি। ভদ্রলোক এক প্রাইভেট কোম্পানীর ক্যাশিয়ার ছিল। নীপুর সঙ্গে

তার স্ত্রী টুলুর মায়ের খুব গলাগলি দেখতাম। একদিন ভদ্রলোক আর অফিস থেকে ফিরল না। তখন কলকাতার যা অবস্থা, কেউ বাড়ি থেকে বেরোলেই প্রাণ হাতে করে বসে থাকতে হত। আদৌ যে কেউ ফিরবে তেমন কোনো স্থিরতা ছিল না। আমাদের গলিতেও বোমা মারামারি, হঠাৎ আলোর বাল্ব্ ভেঙে অন্ধকার তৈরি করে হাঙ্গামা চলত। টুলুরা তিনজন ছোট ছোট ভাইবোন। আর ওদের মা। কেউ বলল অফিসের ক্যাশ ভেঙে পালিয়েছে টুলুর বাবা। কেউ বলল কোম্পানী লক্ আউট্। কেউ বলল নিজের চোখে নাকি দেখে এসেছে টুলুর বাবা বড় রাস্তার মোড়ে স্ট্যাব্ড্ হয়েছে।···মোট কথা, টুলুর বাবা মোটেই ফিরল না। আর বোঝোই তো মধ্যবিত্ত সংসার! কিছুদিন বাদেই দৈন্যদশায় ধরল। নীপু টুলুর মাকে সান্ত্বনা দিতে যেত। আমি যখন কলকাতায় আসতাম বলত,—জানো, কাল ওদের সেলাই-এর মেশিনটা গেল, কোনোদিন বা পাখা, আলমারি, খাট···। একদিন দেখি নীপু ফিরে এসে পয়সার ভাঁড়টা আছড়ে ভাঙছে। আমি বললাম পাগল হলে নাকি? নীপু বলল, 'না: আর পয়সা জমাবো না। মানুষ কি ভেবে জমায়, আর কি করে তা খরচ হয়ে যায়। টুলুর মা আর আমি চড়কের মেলা থেকে পয়সার ভাঁড় কিনেছিলাম। দুজনেই ঠিক করেছিলাম ভাঁড়ে পয়সা জমিয়ে পুজোয় দীঘা বেড়াতে যাব। শেষ পর্যন্ত ওই ভাঁড় ভেঙে রেশন আনতে দিল

ছোটমেসো আর একটা সিগারেট ধরালো।

—এর গায়ে গায়েই ঘটলো আর একটা ঘটনা। আমাদেরই পাশের ঘরের ভাড়াটেদের ছেলে শান্তু। নীপুর কাছে খুব আসত। কাকিমা কাকিমা করে ডাকত নীপুকে। ফাই-ফরমাশ খাটত। হঠাৎ স্কুলে পরীক্ষা নিয়ে কি গণ্ডগোল হ'ল। নীপু বুঝি বাজার-টাজার করতে বেরিয়েছিল। ভিড় দেখে গিয়ে দেখে শান্তু মাটিতে

পড়ে আছে। সারা গায়ে রক্ত। ছেলেটাকে সন্ত বড় হওয়ার বাড়ে পেয়েছিল। নীপু শান্তর মায়ের শোকে-কান্নায় তিনদিন খেতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল পূর্ব-পাকিস্তানে বন্যা হয়েছিল না একবার? সেই যে সেবার বহুলোক মারা গেল। হঠাৎ দেখি নীপু মাঝরাতে উঠে বসেছে। গা ঘামে জবজবে ভিজে। ভয়ে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে নীপু? নীপু বলল, 'ছ্যাখো আমার মনে হচ্ছিল ঘরে জল ঢুকে যাচ্ছে। বেনো জল। আমার নাক মুখ গলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। খাটের চারপাশে মড়া ভাসছে! কলকাতায় এমন বন্যা হবে না তো! আমাদের আবার নিচের তলার ঘর।' আমি হেসে বলেছিলাম, কি যে আজেবাজে ভাবো। পাগল নাকি তুমি। নীপু বলেছিল, 'কেন জলপাইগুড়িতে হঠাৎ বান আসেনি? ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি সব?' আসলে ক্রুড্ করে করে তোমার ছোটমাসির এই অবস্থা। আমিও ঠিক সঙ্গ দিতে পারি না। আর পিনাকীবাবুর হাতেও বিশ্বাস করে সব ছেড়ে দিতে পারি না। আমার আরো মনে হয় রবি, এই যে ব্যবসায় হঠাৎ এতখানি উন্নতি,—এর জন্যেও ওর ভয়। বাড়ি, গাড়ি, গয়না, ভালো খাওয়া-দাওয়া এই স্ট্যাণ্ডার্ড অফ্ লিভিং এ সবের হিসেব তো আমাদের পুরোনো ওই ছোট্ট নোটবইটায় ছিল না।

রবি উঠে দাঁড়াল। মোম পালিশ করা দেয়ালে লাগানো আলমারি। তাতে দু-চারখানা বই, ফাইল কিউরিও। এই একটা আলমারির যা দাম, রবি দামটা জানে, কারণ তাকেই দামটা মিটিয়ে দিতে পাঠিয়েছিল ছোটমেসো,—তাতে রবিদের সংসার ছমাস চলে যায়। ভাই-এর মাস্টারের জন্য মাকে ঝণ্টুবাবুদের ওখানে আয়ার কাজ করতে হয় না। বাগবাজারের সেই গলি থেকে বহুদূর চলে এসেছে ছোটমাসিরা। ঠিকই তো। সবাই তো সমান নয়। সকলের ওপর তো আর একরকম রি-একশন হয় না। ছোটমাসি

হয়ত এতটা স্পীড্, এতটা তোড় সহ্য করতে পারছে না। ওর নার্ভ চুরমার হয়ে যাচ্ছে। রবি চোখ-কান বুজে, কোনোকিছু ভাবনা-চিন্তার মধ্যে না গিয়ে ছোটমাসির দয়ার দান এই ক'মাসের ছুটি উপভোগ করতে চেয়েছিল। তার কি দরকার এত সব ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার। এত সব ভাবনা-চিন্তা করার।

চারপাশ দিয়ে এত রকম স্রোত! রবি তার ডানলোপিলো দেওয়া খাটে কতক্ষণ আর চিন্তাহীন খুশিতে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে? সম্ভব নয়। সে স্পষ্ট দেখতে পায়--মা জনতার কটু গন্ধের মধ্যে বসে বসে সাবু গবম করছে। ছোট ভাই চন্দ্র বুঝতে পারছে না পড়াশুনোটা .মন দিয়ে করবে কি না। পরীক্ষায় নকল করবে। ছোটবোনের নির্বোধমুখ, বাবা চোঁচোঁ করে বিড়ি টান্‌ছে আর রেসের বই উল্টোচ্ছে এক মনে। হঠাৎ তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে যেন আলো বলল, আর তো ফিরে যাওয়া যাবে না। কিন্তু চিনু তার বেরঙা ম্যাকসি ফ্রক পরে চিবিয়ে চিবিয়ে আরাম করে পান খাচ্ছে আর কানের রিঙ্ নেড়ে বলছে, ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে, তা না হলে প্রণবদাকে কে আর বাঁচাত। রবি ক্রমাগত মাথা নাড়তে নাড়তে বলছে—আরম্ভ করতেই হয়, কোথাও না কোথাও থেকে আরম্ভ করতেই হয়। নিজের নরম বিছানায় হাত-পা গুটিয়ে বসে লাল টক্‌টকে আপেলে কামড় দিতে দিতে চোখ-কান বুজিয়ে চিন্তা-হীন আরামে কিছুতেই থাকা যায় না। সম্ভব নয়। রবি চোখ চেয়ে চেয়ে ছোটমেসোর মুখের দিকে স্পষ্ট তাকালো।

—পিনাকীবাবু বলছিল, তুমি নাকি তোমাদের পাড়ার একটি ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছ! ভেরী গুড্। খুব ভালো কথা।

রবি মাথা নাড়ল।—ও দৈবাৎ। হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম!

—আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়াটাও তো দৈবাৎ—

ছোটমেসোর চোখদুটো কোটরের মধ্যে থেকে ঝিল্‌মিল্ করে উঠল।

—তুমি আমাদের ব্যবসাটাকে এবার দেখে-শুনে নিতে আরম্ভ কর। সায়ন ছোট। ও বড় হতে হতে এখনও বেশ দেরি। পিনাকীবাবুকে আমি বিশ্বাস করি না। তোমার বাবাও আজকাল একটু-আধটু কাজকর্ম করছে। কিন্তু তুমি তো জানো ধীরেনবাবুকে খুব একটা রেসপনসিবিলিটির কাজ দেওয়া যায় না। কি বলো, সামনের হপ্তা থেকে তাহলে আমার সঙ্গে বেরোচ্ছো তো !

রবি মাথা তুলে বলল,—যদি বলেন, কাল থেকেই বেরোই !

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রবি।

—এখনও মুখে এমন একটা ভঙ্গি ধরে রেখেছে, যেন ছোট-মেসোর অফারটা পেয়ে সে খুব আশ্চর্য হয়ে গেছে। আসলে একটুও আশ্চর্য হয়ে যায়নি। নিজেব চোখে নিজেই ধুলো দিয়েছিল। এ তো জানাই কথা। ববি লোভে লোভে এসেছে। হাসপাতালে যখন মা বাবা কিছুতেই বিশ্বাস করছিল না যে সে কোনো পার্টি করেনি, পুলিশও থরো ইনভেস্টিগেসন করছিল, রবির ছোটমাসিদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা না হয়ে গেলে হয়ত তার চিকিৎসাই পুরো হতো না। তাব ওপর ববির সম্বন্ধে তখন কত রকম রটনা। কেউ বলছে সে পুলিশের অ্যাপ্রুভার হয়েছে। কেউ বলছে সে পার্টির মস্ত ওয়ার্কার। আবার কেউ বলছে হাসপাতালের ভেতরেই তাকে গুলি করে মারা হবে। সে অবস্থায় তার মা কি করেই বা তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। বাদামতলা লেনের ওই খুপ্‌রিতে যে কোনো সময় ঢুকে পড়তে পারে আততায়ী। সেই সময় ছোটমাসি আর মেসো ভরসা দিয়েছিল অন্তত কিছুদিন তারা রবিকে রাখবে। রাখতে গিয়ে দেখেছে রবি, রবি-ই। রবির মাতাল বাবা ধীরেনবাবুর কোনো ছায়া নেই তার ওপর।

হঠাৎ রবির মনে হ'ল আচ্ছা মধুরার বাড়ি কি ফোন আছে ? যদি থাকতো তাকে এখুনি ফোন করে বলা যেত তার একটা চমৎকার চাকরি হয়ে যাচ্ছে !

মধুরা কি এখনো এককালে তাকে কলকাতায় যে মাস্টারমশাই পড়াত তার সঙ্গে পার্কে ঘুরছে।

রবির মনে হ'ল মাস্টারমশাই ডেঞ্জারাস্ নয়, মধুরার যৌবনও, সবচেয়ে ডেঞ্জারাস্ ওই গাছ ফুল ঝিল আর কুঞ্জ সাজানো পার্কটা। ওই পার্ক, ওই পাখির ঝাঁক ওই বিকেল—হু-হু হাওয়া!

ওদের জন্যেই সব পরিচিত ছবি এলোমেলো হয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অভাবনীয় একটা তৃতীয় রাস্তা খুলে যায়!

৫

প্রণব যেন অনেক ভিতর থেকে রবির দিকে তাকিয়েছিল। রবি ওর ঠাণ্ডা, এলানো আঙুলগুলো মুঠো করে ধরে রেখেছিল। প্রণবকে দেখতে এলে রবিকে এভাবেই বসে থাকতে হয়। দু ঘণ্টা মুখোমুখি চুপচাপ। এই হাসপাতাল থেকে কিছুদিন আগে বেরিয়েছে রবি। তাই বয় ওয়ার্ডার নার্স ডাক্তারেরা প্রায় সবাই-ই রবির চেনা। রবি প্রণবের সামনে ডেকে ডেকে সবারই সঙ্গে গল্প শুরু করে দেয়। প্রণব মন দিয়ে শোনে। যেন তার মস্তিষ্কের সব রং উঠে গেছে। পৃথিবীটাকে আবার নতুন করে ফিরে দেখছে প্রণব। সুজাতাদিও সময় থাকলে মাঝে মাঝে প্রণবকে দেখতে আসে। রবিকে কায়দা করে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে—চুপচাপ বসে থাকিস কেন? প্রণবের সঙ্গে নানারকম কথা বলবি!

চাপা গলায় রবি বলত, আমি কি করব, ও যে একদম কথা বলতে চায় না। কেমন গুম্ মেরে থাকে!

—অমন গুম্ হয়ে থাকাটাই ভালো নয়। বাইরে গিয়ে আবার নিজের ওপর অ্যাটেমপট্ করতে পারে।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে রবি আচম্‌কা বলল, একটা সন্দেশ দেব? খাবি?

প্রণব মাথা নাড়ল।

পাশের বেড থেকে একজন বুড়ো মত, পা ভাঙা ভদ্রলোক রবিকে জিজ্ঞেস করল,—ওর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই? কোনো ভিজিটর ওকে দেখতে আসে না কেন?

রবি ইশারায় বুড়োকে চুপ করালো।

ভিজিটার, আত্মীয়স্বজন! এতসব দেখবার শোনবার লোক

থাকলে একটা সারা পরিবার কখনো বিষ খেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে চায়। কাগজে খবরটা পড়েও তো প্রণবের কোনো আত্মীয় এল না। অথচ রবি তো প্রণবের দু-চারজন আত্মীয়কে ওদের বাড়ি আসতে যেতে দেখেছে।

—তাহলে হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলে ষোল নম্বর যাবে কোথায়? বুড়োর পাশের বেডের আর একজন রোগী বুড়োকে বলল। সত্যিই তো! এটা তো একটা কথার মত কথা। হাসপাতালের বেডে যতক্ষণ শুয়ে আছে প্রণব, রবি না হয় ততক্ষণ কায়দা কৌশল করে তাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করল। কিন্তু তারপর? রবি না হয় দৈবাৎ গিয়ে পড়ে প্রণবকে আসন্ন মৃত্যুর থেকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু সে এক কথা আর প্রণবকে ক্রমাগত বাঁচিয়ে রেখে দেওয়া সে তো সম্পূর্ণ আলাদা একটা ব্যাপার।...রবির হঠাৎ বাঁশিবাবুর কথা মনে পড়ল।

রবি যখন হাসপাতালে ছিল তখন ওর পাশের বেডে ছিল বাঁশি-বাবু। হাসপাতালে বাঁশিবাবুর দারুণ প্রেসটিজ্। কারণ তার রোগটা ছিল খুব রেয়ার। প্রথমে ম্যাল্‌নিউট্রিশনের জন্যে বাঁশিবাবুর চিকিৎসা হয় বেশ কিছুদিন। তারপরে বাঁশিবাবুর পেটে খুব কমপ্লিকেটেড্ অপারেশন হয়। দু দুবার। সব সময়ই বাঁশিবাবুকে ঘিরে থাকত বড় বড় ডাক্তার আর হাউস সার্জনরা। অপারেশনের পর যখন বাঁশিবাবু সেরে গেল, তখনই লক্ষ্য পড়ল বাঁশিবাবুর কোনো ভিজিটার আসে না। বাঁশিবাবু ভিজিটিঙ্ আওয়ারের সময় ছোট হয়ে যেন বিছানার ভিতর লুকিয়ে পড়তে চাইত। একদিন বড় ডাক্তার এসে বলে গেলেন বাঁশিবাবু ভালো হয়ে গেছেন। সাতদিনের মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। রাতে নিজের ব্যথার যন্ত্রণায় রবি যতবারই উঠে পড়ত, দেখত, বাঁশিবাবু বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে জেগে বসে আছে। তার মুখটা বড় জানলার দিকে ফেরানো। যেদিন বাঁশিবাবুর বাড়ি যাবার কথা ছিল, তার আগের দিন রাতে

রাতে বাঁশিবাবু ছাদে উঠে পাঁচতলা থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে মারা যায়।

রবি ভুরু কুঁচকে প্রাণপণে মনে করতে চেষ্টা করল প্রণবদের বাড়ি ওদেব আত্মীয়স্বজন কে কে যাতায়াত করত।

—আচ্ছা প্রণব! তোর একজন কাকা ছিল না?

কালো মত, গোল ধরনের চশমা-পরা শুক্‌নো চেহারার একটা লোক। প্রণব রবির কথার কোনো উত্তর দিল না। অদ্ভুত একটা উপহাসের হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সেই আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। প্রণবের হাসিটা যেন একটা চাবিব মত। কুলুপ ঘুরিয়ে চিন্তার পর চিন্তা খুলে ধরছিল। মরার আগে প্রণবের বাবা কোনোরকম চিঠিপত্তর লিখে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। যে লোকটার কারখানা বহুদিন ধরে লক-আউট, ক্রমশ ক্রমশ যার ছেলেরা লেখা-পড়া মেলামেশা বন্ধ করে দিচ্ছিল। এখানে ওখানে চাকরির চেষ্টা করেছে লোকটা, স্ত্রীর গয়না, হাতঘড়ি সব টুকটাক্‌ বিক্রি করতে আরম্ভ করেছে—তখন কি সে একবারও তাব আত্মীয়স্বজনের কাছে যায়নি? যদি না গিয়ে থাকে তাহলে সে কি জানত, গিয়ে কোনো লাভ হবে না! এই বাদামতলা লেন দিয়েই প্রণবরা এসেছে গেছে, রেশন তুলেছে, বাজারও করেছে হয়ত। কিন্তু তখনই কি পরিবারটা সমাজ থেকে ক্রমশ আলাদা হতে হতে নিজেদের ভেতর গুটিয়ে যেতে বসেছিল? রান্নাবান্না উনুন-জ্বলা এসব সত্ত্বেও। যে কোনো কারণেই হোক ওরা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেনি। অনেক আগেই মৃত্যুর স্রোতের দিকে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। যে কোনো কারণে, কিংবা হয়ত অনেক কারণেই এই পৃথিবীটাকে টিকে থাকার পক্ষে অনুপযুক্ত ভেবেছিল ওরা। তাই বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে, তারা স্থির করেছিল মৃত্যুই অনেক সহজ।

প্রণব হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে একা একা কি করবে? কোথায় যাবে? এই মুহূর্তে প্রণবকে বলতেও লজ্জা করল রবির—

কাল থেকে ও ছোটমেসোর সঙ্গে অফিসে বেরোবে। কোনো ইণ্টারভিউ না, রোদ্দুরের মধ্যে লাইনে দাঁড়ানোর কষ্ট না প্রথম দিন থেকেই গাড়িতে অফিস যাবে। তারপর তেমন হোমরা-চোমরা হয়ে পড়লে, চাইকি প্রণবের জন্যেও একটা যাহোক ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

এমারজেন্সীর বেবি ওয়ার্ড থেকে সুজাতাদি আর চামেলিদি প্রণবকে দেখতে এলো। সুজাতাদির কোলে নার্সদের বাতিল, ছেঁড়া অ্যাপ্রন জড়ানো একটি শিশু। ছাল ছাড়ানো লাল মাংসের তৈরি মনে হয়। চিম্‌ড়ে হাত-পা। সুজাতাদি নিচু হয়ে আস্তে আস্তে প্রণবের কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল,—আজ কেমন আছো প্রণব?

প্রণবের দু চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাথা নেড়ে অস্ফুট গলায় বলল, ভালো! সুজাতাদি নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ায়, রবির মুখের কাছে চলে এসেছে বাচ্চাটা। ছেঁড়াখোঁড়া হলেও, ধোয়া অ্যাপ্রন জড়ানো। হাতের কব্জিতে আবার হলুদ সুতোয় দুব্বোঘাস বাঁধা। গা থেকে উঠ্‌ছে হাল্কা বেবি পাউডারের গন্ধ। সে বলল,—এই বুঝি সেই বাচ্চাটা?

সুজাতাদি বলল—হ্যাঁ রে? যাক্ বাচ্চাটা শেষ পর্যন্ত বেঁচেই গেল।

চামেলিদি বলল—আমরা ওর খুব সুন্দর নাম দিয়েছি রবি। শকুন্তলা!

প্রণবও ঘাড় তুলে তুলে বাচ্চাটাকে দেখছিল। তার চোখে-মুখে

সেটা লক্ষ্য করেই সুজাতাদি বলল—রবি, প্রণবকে এটার কথা বলিসনি? বল্ এখন!

রবি কথা বলার একটা বিষয় খুঁজে পেল যেন। শকুন্তলার গল্প আস্তে আস্তে শোনাতে লাগল প্রণবকে।

সুজাতাদি যাবার সময় বলল—আমার ডিউটি এখুনি অফ্ হয়ে যাচ্ছে, তুই হাওড়ায় যাবি নাকি ?

রবি বলল—যাবো !

প্রণব সুজাতাদি চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বলল—সুজাতাদি আমাদের দেখা কারো মত নয়, না ? কেমন অন্য রকমের···

প্রণবের শীর্ণ মুখটাকে ধাতুর মুখোশের মত দেখাচ্ছিল। অপার্থিব। রবি মন থেকে কিছুতেই প্রণবের স্যুইসাইডের ব্যাপারটাকে তাড়াতে পারছিল না। তবে কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল রবিদের ? হয়ত হয়েছিল। হয়ত মন থেকে সরে গিয়েছিল জগতের সেই সব দিক, যে সব দিকেব কথা মনে রেখে মানুষ আশায় বাঁচে। এমন হয়। হতে পারে। আশাই বেঁকে চুরে মনের ভিতরে তৈরি করে দেয় নৈরাশ্য। হতাশা।

রবিদের বাদামতলা লেনের গলিটা সরু। অকিঞ্চিৎকর। কাছেই বরানগরের গঙ্গার ঘাট। এই ঘাটের সহায়তায় বস্তিপাড়ায় এক ধরনের কুটিরশিল্পই গড়ে উঠেছে। বারো মাসে তেরো পার্বণে, পূজায় নানাবকম সুন্দর সুন্দর দেবদেবীর প্রতিমা ওঠে। একদল লোক যেন টুইয়ে থাকত। প্রতিমা. বিসর্জন দিলেই তারাও ভাসান যেত প্রতিমার সঙ্গে। তুলে আনত জলে ভেজা মুখ, হাত, গলে যাওয়া প্রতিমার কাঠামোগুলোকে। তারপর খাপ্রার চালে তুলে রাখত। তারপর যখন কালীপুজো আসত, সেগুলোকে নামিয়ে মাথায় হাঁড়ি, বুকে দীর্ঘ দীর্ঘ স্তন বসিয়ে হাত পা মুচড়ে বাঁকিয়ে তৈরি করত প্রেতের সারি। তারপর সাজিয়ে রাখত পোটোপাড়ার সামনে। সবাই কালীমূর্তি কিনে, চারপাশে সাজানোর জন্যে নিয়ে যেত এইসব সস্তা দরের ভূত। সেই সব বিকৃত চেহারা দেখে কে বলবে এরাই কোনোদিন সুন্দর সুন্দর প্রতিমা ছিল।

শুধু কি জীবনের কালো অন্ধকার দিকটাই মনে করে রেখে দিতে

চায় প্রণব ? শুধু কি সেই সব মানুষের কথাই তার স্মৃতিতে কঠিন হুল ফোটায়, যারা তার বাবার কারখানায় রাজনীতির খেলা খেলতে গিয়ে ধর্মঘট করে সবাইকে বেকার বানালো। যারা নিরুপায় হাত পাততে গেলে হাত গুটিয়ে নিয়ে খেদিয়ে দিল। কিন্তু আরো তো আছে !

রবি হঠাৎ প্রণবকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা প্রণব তোর মনে পড়ে না সেই গঙ্গার ধারের জোড়া শিবমন্দিরের বুড়ো পুজোরী ঠাকুরের কথা। যে আমাদের প্রসাদ দিত। ছোটবেলার গাঁয়ের গল্প বলত, আর ইস্কুল পালালে নিজের কাছে সারা দুপুর বসিয়ে রেখে হাত ধরে বাড়ি পৌঁছে দিত।

প্রণবের চোখেব তারা দুটি উত্তেজনায় এদিক ওদিক করল এক-বার। তারপর যেন রবির দিকে ঘুরে সাড়া দিয়ে বলল, আর কদমতলার সেই বুড়ো মুচি ভকত ভাই যে নিচু হয়ে বসে মন দিয়ে জুতো সারত আর আমাদের কি সুন্দর সুন্দব রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলত···

আর সেই চারুদিদি।

হ্যাঁ, সেই গোবরকুড়ানী দাসী। কত সব ছেলেপুলে রাস্তাঘাট থেকে তুলে তুলে নিয়ে এসে বশ মানাতে চেষ্টা করত না ?

কথা বলতে বলতে ঢং ঢং করে ছটার ঘণ্টা বাজল। রবি উঠে মিট্‌সেফ্‌ থেকে তার আনা সন্দেশের বাক্‌সটা বের করে প্রণবের মুখে একটি সন্দেশ তুলে দিল। প্রণব প্রথমে না না বললেও, আস্তে আস্তে সন্দেশটা খেতে লাগল। হঠাৎ রবির ভিতরটা উথ্‌লে কান্নার মত কি যেন উৎসারিত হতে লাগল। প্রণব তার কে ? কেউ না। চেনাশোনা। পাড়ায় বাড়ি এই তো। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সে বুঝতে পারল প্রণব তার নিজের অনেক আপন। এক বয়সের, এক কালের এক দুঃখেব সঙ্গী। সে রুদ্ধ গলায় শুধু বলতে পারল,—'আমি আছিরে প্রণব ! তুই কিচ্ছু চিন্তা করিসনে।'

তারপর, সে একবারও প্রণবের দিকে ফিরে না তাকিয়ে ওয়ার্ড থেকে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বাইরেই প্লাস্টিকের বাল্‌তি ব্যাগ্‌ নিয়ে অপেক্ষা করছিল সুজাতাদি। দুজনে পাশাপাশি চুপচাপ হাঁটতে লাগল। বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে আঁচলে মুখ মুছে সুজাতাদি বলল—বেশ গরম পড়ে গেছে না রে?

তখন বিকেলের তেজ যায়নি। সুজাতাদির টান করে বাঁধা চুলের মধ্যে মধ্যে দু-একটা শাদা তার তাই চোখে পড়ে গেল রবির। চোখের কোলটা বেশি বসা লাগল। বসা হলেও সুজাতাদির চোখ দুটি বড় সজল, কোমল। সুজাতাদির চোখ দেখতে দেখতে হঠাৎ আলোকে মনে পড়ে গেল রবির। আলো কিন্তু দেখতে ভারি সুন্দর। সেকেলে কাঁসার বাসনেব মত। কাজে লাগে না বলেই খামোখা কলঙ্ক ধরে।

আলো সুন্দর। সত্যিই সুন্দর। চিন্নুর চেয়ে। মধুরার চেয়েও। কারণ একটা বুঝতে পারার বোধ আলোকে এত সুন্দর করে তুলেছে। আলো জানে আর ফিরে যাওয়া যায় না। এখনও হয়ত আলো কষ্ট পাচ্ছে। এই গরমে বন্ধ ঘরে একা একা শুয়ে কাটাচ্ছে, হয়ত এখনও ভাত খাচ্ছে না, হাসছে না স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে না। কিন্তু রবি জানে আলো একদিন স্বাভাবিক হবে। কথা বলবে। সে বুঝতে পেরেছে সে একটা রাস্তার শেষে পৌঁছে গেছে। এখন পিছনে ফেরা চলে না। এখন সামনের কোনো রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে হবেই তাকে। থামবার উপায় নেই।

হাওড়ার ব্রীজ পেরোবার সময় ভরাট ভর্তি গিন্নীবান্নীর মত গঙ্গা ছলছল করে উঠছিল দু পাশে। এ সময় সবাই গঙ্গাকে নমস্কার না জানিয়ে পারে না। রবিরও সাধ গেল। এ একটা বিপুল ঘটনাকে প্রণতি।

সুজাতাদি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। রবি বলল,—

আমি মাকে বলেছি আলোর জন্যে মহিলাআশ্রমের কথা। মা বলেছে চেষ্টা করবে।

সুজাতাদি বলল, আর চেষ্টা। তোরা যদি সঙ্গে সঙ্গে কিছু ব্যবস্থা করতে পারতিস্। এখন তো আমার এক পাঞ্জাবী পেসেন্ট্ সব জেনেশুনেও আলোকেই বিয়ে করতে চাইছে। লোকটা মানুষ খুব দিলদরিয়া। চাঁদনীতে কাটা কাপড়ের দোকান আছে।

রবি হেসে বলল, বাঃ সুজাতাদি তোমার গলগ্রহগুলো বেশ তো। ঘাড়ে যেমন এসে চাপে তেমনি ঘাড় থেকে টুপটাপ্ আপনিই খসে যায়। প্রথমত ধরো আমি। তারপর সেই যে কে এক ঠাকুমা এল, যার ছেলেরা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর তোমার সেই বন্ধুর বেকার ভাই। সুরপতি না কি যেন নাম। তারপর আলো···শুধু যা দেখছি, কিশোরীবাবুই টিকে গেল।

সুজাতাদি হঠাৎ রবির দিকে চেয়ে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল,

—তুই আলোকে একটু বুঝিয়ে বল না রবি। এই বিয়েটা ওর পক্ষে খুব ভালোই হবে।

সুজাতাদির কথার ভঙ্গিতে একটু চমকে তাকাল রবি। সুজাতাদি কখনো এমন প্রার্থীর মত করে কথা বলে না।

সেতু পেরিয়ে বাস বদল করল তুজন। সুজাতাদির বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। উঠোনে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল রবি সুজাতাদির ঘরের সামনের দালানে আলো স্টোভ জ্বেলে সাড়ম্বরে জলখাবার বানাচ্ছে। পাশে লুচি বেলা রেডি। সুজাতাদি এলে গরম গরম ভেজে দেবে। ওদের দেখে ঘুরে তাকাল আলো। এ আলোকে আর চেনা যায় না। একেবারে খুশিতে ঝলমল করছে। চওড়া নকশা পাড় একটা শাড়ি-পরা। আজও গরমে ঘামে চিক্‌চিক্ করছে আলোর মুখ। কিন্তু এ ঘাম ভয়ের নয়। পরিশ্রমের নিবিড় জোড়া ভ্রূতুটির তলায় আধবোজা চোখ তুটি হাসছে। মাথার

চুল একটু পাতা কেটে আঁচড়ে পিঠে ফেলা। কপালে বড় গোল টিপ। ওদের দেখে খুব খুশি।

রবি উঠে এসে আলোর এগিয়ে দেওয়া একটা জীর্ণ মোড়ায় বসল। একটা জলচৌকিতে বসে আছে কিশোরীবাবু। চমৎকার সজ্জানে। মাথার থোপা থোপা চুলগুলি পরিপাটি করে আঁচড়ানো। দাড়ি কামানো মুখ। পরিষ্কার। কিশোরীবাবুর পরনে কালাপাড় ধুতি আর শাদা ফতুয়া। কিশোরীবাবুও ওদের দেখে খুব খুশি।

সুজাতাদি কিশোরীবাবুর পিছন দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

রবি বলল,—বাঃ, কিশোরীবাবু, বেশ লাগছে কিন্তু আপনাকে।

কিশোরীবাবু হেসে বললেন,—সে ভাই আমাকে কবেই বা মন্দ লাগে ? সোনার আঙটি যে ! যে অবস্থায় দু-চারবার দেখেছ তখনো ঐ সোনার আঙটিই দেখেছ—তবে কিনা একটু বাঁকা !

কিশোরীবাবুর কথার ধরনে মানুষ না হেসেও পারে না।

আলো বলল,—মেলা থেকে অনেক সব জিনিস কিনেছি। দেখবেন !

—মেলায় যাওয়া হয়েছিল বুঝি ?

কিশোরীবাবু বলল, আর বোলো না রবি, কি আব্দেরে মেয়ে রে বাবা !···ওই যে শ্যামঠাকুর না কিসের মেলা হয় বেগুনতলির দিকে !

আলো দালানে ঝোলানো খাঁচা দেখাল।

—ওই যে খাঁচার পাখি—ওই যে দোয়েল কিনেছি। ফুলমাসি পয়সা দিয়েছিল। সেই পয়সা দিয়ে।

কিশোরীবাবু হেসে বললেন,—কেবল ফুলমাসির পয়সাতেই সব কেনা হয়েছে বুঝি ! চুড়ির দোকানে গিয়ে কি আব্দার ! ওই যে হাতে লাল সোনালী চুড়ি !

রবি দেখল লাল সোনালী কাচের চুড়িতে সতেরো বছরের মেয়ের হাত কি আকাশ-পাতাল বদলে যেতে পারে !

—হ্যাঁ দিয়েছেন তো। তাতে কী? অত বার বার শোনাচ্ছেন কেন?

—দাঁড়িপাল্লার ওজন সমান তো? ফুলমাসির দিকটা ভারী নয়তো! কিশোরীবাবু হোহো করে হেসে উঠল।

সুজাতাদি এসে দাঁড়াতেই কিশোরীবাবু বলল—'মেয়ে বানিয়েছে বটে নার্স মেমসাহেব! সারাদিন ধরে মোড়লগিরি করবে! আর মেমসাহেবের তো কাণ্ড একবার বেরোলে আর ঘরে ফেরার কথা ভুলেই যান তো! ফলে ওই মেয়েকে তুমিই ছ্যাখো! ব্বাপ্‌স!

সুজাতাদি কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। রবি লক্ষ করল সুজাতাদির চোখে যেন একটা অব্যক্ত ব্যথা থরথর করে কাঁপছে। আলো বলল,—ফুলমাসি এসো, লুচি ভাজছি গরম গরম।

সুজাতাদি বলল,—দাঁড়ারে মা দাঁড়া, হাসপাতালের পোশাকটা ছেড়ে আসি!

আলো বলল—তাড়াতাড়ি, গাদা গাদা জল ঢালবে না একদম।

রবি বলল, বাব্বা, সুজাতাদিকে আবার তুমি শাসনও করছ আজ কাল!

লুচি খেতে খেতে রবি ভাবল, কখন আড়াল পাবে। সুজাতাদিকে বলবে—সুজাতাদি আলোকে নিয়ে তোমার আর কোনো ভাবনা নেই। কিশোরী মিত্তিরও বেশ তারিয়ে তারিয়ে লুচি তরকারী খাচ্ছিল।

রবির হঠাৎ মনে হল কিশোরী মিত্তিরকে নিয়েও সুজাতাদির আর কোনো ভাবনা নেই। রবির সঙ্গে কিশোরী মিত্তিরের অল্প-স্বল্প রসিকতা চলত। রবি সন্তর্পণে বোতলের সাইজ দেখিয়ে কিশোরী মিত্তিরকে বলল—ওটা চলছে!

—অল্প-স্বল্প! নার্স মেমসাহেব তো বাড়িতে থাকে না। এই মেয়েটাকেই সবস্ব করতে হয়। বমি ধোওয়া থেকে চান করানো থেকে খাওয়ানো, পোশাক বদলানো—সব! সে বড় আতান্তর। তাই যদ্দিন না ওর বিয়ে-থাওয়া হয়, ভদ্র-সভ্র হয়ে থাকছি আর কি?

আলো চুপচাপ শুনছিল। মাথা হেলিয়ে বলল, আমি বিয়ে করলে তো!

ববি বলল, তা কাজকম্ম কিছু করছেন এখন কিশোরীবাবু!

—বাপেব জন্মে যা করিনি তাই কবব? কাজকম্ম! খেপেছ? কেবল আগে যেমন রেসের টিপ্‌স মেলাতাম এখনও তেমনি মেলাচ্ছি! রেসের মাঠে গিয়ে মক্কেল পাকড়াই। প্রথম দিকে জিতলে হাত ভবে টাকা ছাড়ে। তাই দিয়ে টুকটাক খেলি। আর টুকটাক খেললে আমার কপাল এমন হাত খালি যায় না। কিছু না কিছু এসেই যায় হাতে। তা ছাড়াও এখন আর একটা পুরোনো নেশা ধবেছি। বাড়ির দখল নিয়ে মামলা। বড় ফ্যামিলির ছেলে তো বে বাবা। মবা হাতী লাখ টাকা। আমার আবার উকিল মোক্তাবেব ভাবনা! ইচ্ছে কবলে এখুনি এই সারা বাড়িটাই নিয়ে নিতে পাবি! তবে অধম্ম করাব ইচ্ছে নেই। নিজের পোর্সনটা পেলেই যথেষ্ট।

ববি দেখল আলো মুগ্ধ হয়ে কিশোবীবাবুব কথা শুনছে। তাকিয়ে আছে তো আছেই। কিশোরীবাবুর কথা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আলোব যেন আব দেখার শেষ নেই। সুজাতাদির কথায় সম্বিত ফিরল তাব। 'কৈবে মা, চা খাবার দে!'

আলো সুজাতাদিব সামনে খাবারেব থালাটা এগিয়ে দিয়ে চা তৈরী কবতে করতে কিশোরীবাবুকে বলল,

—কই, তুমি যে বলেছিলে সিনেমা দেখাবে! তাব কি হলো?

—নার্স মেমসাহেবের ইভনিঙ্‌ ডিউটিগুলো শেষ হোক্‌।

—না, ফুলমাসি বোজ দেরি করে আসে। তুমি আমায় নিয়ে দেখাবে চল!

কিশোরীবাবু অসহায়ের মত সুজাতাদির দিকে তাকাচ্ছিল। যাতে চোখে চোখ না মেলে, সুজাতাদি খাওয়ার প্লেট্‌ হাতে ঘরে উঠে গেল। রবিও চায়ের পেয়ালা নিয়ে পেছন পেছন গেল সুজাতাদির।

চাপা গলায় বলল,—সুজাতাদি এক বছর চেষ্টা করে তুমি যা পারো নি, আলো তা এই ক'দিনেই পেরেছে—

সুজাতাদির চোখ দুটি যন্ত্রণা-কাতর অবোলা জন্তুর মত ছলছল করে এলো।

—পেরেছে আবার পারেনিও।

—মানে ?

—তুই ছোট ভায়ের মত। তোকে আর খুলে কি বলব বল্। কিশোরীবাবুকে আলো যে চোখে দেখেছে, সে চোখে কিশোরীবাবু কিন্তু…

—ফুলমাসি-ই, এখানে এসো। চা নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠল আলো।

রবি ফিরে এসে মোড়ায় বসল। বলল, আলো তোমার বিয়ের ঠিক করেছি আমরা তা জানো! পাত্র খুব ভালো। কাটা কাপড়ের দোকান আছে চৌরঙ্গিতে।

কিশোরী মিত্তির হাততালি দিয়ে বলল,—খুব ভাল কথা। দাও সাতপাক ঘুরিয়ে দাও।

আলো রাগে গন্‌গন করে উঠল, আমি কখনো বিয়ে করব না! না, না!

সুজাতাদি ঠাণ্ডা গলায় বলল,—না, না, তোর নিজের ইচ্ছে না হলে তোকে কেন বিয়ে দেব আলো বল্ ?

আলো শান্ত হয়ে বাসন-কোসন গোছাতে লাগল, মাজতে যাবে বলে।

কিশোরী মিত্তির উঠে নিজের ঘরে গেল। রবি ঢুকলো সুজাতাদির ঘরে। ঘরটা আলো কেমন গুছিয়েছে, দেখার ইচ্ছে তার। সত্যিই ঘরটার ছাঁদ ফিরেছে। ঝাড়ামোছা পরিষ্কার। দেওয়ালে একটা ছবি ঝুলত। তার কাচ ঝাপসা থাকত সব সময়। এখন সেটা ঝক্‌ঝকে পরিষ্কাব। কাচের ওপাশ থেকে স্পষ্ট হয়ে

ওঠা এক অচেনা ভদ্রলোক উঁকি দিচ্ছেন। রবি এর আগেও ছবিটা দেখেছে। লোকটি কে? সুজাতাদিকে কখনো জিজ্ঞেস করেনি। আজ যেন তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে গেল। আলো এসে বেশ গেরস্ত করে দিয়েছে সুজাতাদিদের।

তবু আলোকে নিয়ে সুজাতাদির খুব ভাবনা। কিন্তু কেন এত ভাবনা। আলো তো সুজাতাদিদের টবে দিব্যি ধরে গেছে। এবার ওর লতাপাতা ফুলফল ধরাবাব সময়। হঠাৎ রবির মনে বিছ্যুচ্চমকের মত ঝিলিক্ দিয়ে উঠল একটি কথা। আলো আব কিশোবী মিত্তির! কিশোবী মিত্তির আর আলো ··আব সুজাতাদি সারাদিন থাকে না···আলো আর কিশোরী মিত্তিব···সারা বাড়িতে একটা সুরাসক্ত পুরুষ আব আলোর মত মবতে মবতে বেঁচে উঠতে থাকা একটা মেয়ে···

রবির ইচ্ছে করল কিশোরী মিত্তিবের ঘবটাও একবাব দেখে আসে। আলো নিশ্চয়ই ওই পোড়ো গুদোমঘরটাও কিছুটা ঠিক্-ঠাক্ কবেছে। রবি বেবিয়ে এল। তখনই আলো ধোয়া বাসন নিয়ে দালানে উঠে আসছিল। দালানের তাবে ঝোলানো বাল্বের খানিকটা কিশোরী মিত্তিবের ঘরে রেশ পড়েছে। সেই আলোয় ববি আর আলো ছুজনেই দাঁড়িয়ে দেখলো কিশোরী মিত্তির আর সুজাতাদিকে। একজন যেমন প্রগাঢ়, আর একজন তেমন সমর্পিত।

আলো আস্তে আস্তে বাসনগুলো নামিয়ে বাখল। এত আস্তে আস্তে যে, শব্দ হল না একটুও। তারপর হাতছানি দিয়ে ডাকল রবিকে। উঠোন পেরিয়ে দরজা পেরিয়ে পোড়ো দেয়ালের অন্ধকারে নিয়ে গেল রবিকে। চাপা রুদ্ধ গলায় বলল,—তুমি আমায় বিয়ে করতে পারো না?

রবি চুপ করে রইল। এ কথার সহসা উত্তর দেওয়া যায় না।

—পারো না বিয়ে করতে? আমার দোয়েল, আমার কাচের চুড়ি—, আমার ফুলকাটা রুমাল···

বলতে বলতে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল আলো।

রবি বুঝতে পারল আলো আস্তে আস্তে তার নতুন টবের মাটি থেকে একটার পর একটা শিকড় ছিঁড়ে ফেলছে। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সুজাতাদি।

—কি রে রবি, তুই আমাকে না বলে চলে যাচ্ছিস?

—না যাইনি সুজাতাদি?

—ওখানে অন্ধকারে কে দাঁড়িয়ে রে?

—আলো!

সুজাতাদি এগিয়ে এলো। আলোর খুব কাছে। একটা হাত আলোর কাঁধে রেখে, আর এক হাতে তার চিবুক ধরে বলল—একি! তুই কাঁদছিস আলো? আলো···লক্ষ্মীটি আলো!··· রবি? তুই কিছু বলেছিস আলোকে।

আলো মাথা নেড়ে বলল—না, না!

সুজাতাদি ওর মাথাটি বুকে টেনে নিয়ে বলল,—তুই কখনো কাঁদবি না আলো। অনেক কেঁদেছিস তুই, আমি তোকে আর কাঁদতে দেব না।

৬

হাওড়া থেকে ফিরে, খেতে বসতে বসতে রাত গোরটা বাজল।

এ' কদিন ববি একা একাই খাচ্ছে। কারণ সায়ন হোস্টেলে চলে গেছে। ছোটমাসি আর রূপু বেলাবেলি খেয়ে নেয়। ছোট-মেসোর কোনো ঠিক নেই কখন খাবে না খাবে। আদৌ বাড়িতে থাকে কিংবা খায় কিনা ছোটমেসো ববির সন্দেহ আছে। ক্বচিৎ খেলেও, তা পাখির আহার।

স্নান সেরে স্নিগ্ধ হয়ে ববি খাবার টেবিলে এসে বসল। অদ্ভুত লাগে তার। পালিশ করা টেবিলের ওপর বিলিতি বাসনগুলো নিজেদের মুখ দেখছে। ঢাকনা খুললেই গরম ভাপ বেরুবে ভাত থেকে, মাংস থেকে। অথচ লোকজনরা খাবার সাজিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে সরে যে কোথায় লুকিয়ে যায়। ববি যখন খেতে বসে তখন শুধু শুধু দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে অদরকারী সব আলো, বাসনে বাসনে স্তূপাকার হয়ে থাকে উপ্‌চে পড়া খাদ্য। যেন রূপ-কথায় পড়া সেই ঘুমন্তপুরীর মত। যেখানে জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই। শুধু জিনিস আর জিনিস। থরে থরে, প্রস্থে প্রস্থে সাজানো।

ববি উঠে পড়ল। খাওয়ার পর সে বেড়াতে যায়। দিবানাথ-বাবু বলেছেন আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ানো স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো। দিবানাথবাবুর এই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কথাগুলো শুনতে ববির খুব ভালো লাগে। সে ত্রিফলার জল, চিরেতার জল, শুকনো হরিতকী আমলকীর গুণাগুণের কথাই হোক, কি বিছানার তলায় নিমপাতার ঝাড় রাখা আর বালিশের তুলোয় কাঁঠালী চাঁপার পাপড়ি মিশিয়ে নেওয়ার কথাই হোক। মন দিয়ে শোনে।

কিন্তু আজ রবি বড় ক্লান্ত। সারাদিন তার কম ঘোরাঘুরি হয়নি। প্রণবকে দেখতে যাওয়া, সুজাতাদির বাড়ি যাওয়া। ঘুরে ঘুরে এতদূর ফিরে আসা আবার। পিঠের শিরদাঁড়া টন্‌টন্‌ করছিল। তা সত্ত্বেও সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে রবি ঠিকই বুঝতে পারল আজ যত ক্লান্তিই আসুক, ঘুম আর কিছুতেই আসবে না চোখে। রবি আজ অত্যধিক জেগে গিয়েছে।

এই জেগে ওঠার ব্যাপারটা অনেক রাত পর্যন্ত আজ জ্বালাবে রবিকে।

ঘরে ঢুকে রবি টের পেল তার পরনের পাঞ্জাবিটা ভ্যাপ্‌সা গরমে এর মধ্যেই ভিজে উঠেছে। স্নানের স্নিগ্ধতা উড়ে গিয়ে ল্যাভেণ্ডার গন্ধ বডিপাউডারের সঙ্গে মিশ্‌ছে ঘামের গন্ধ।

হঠাৎ এত ঘাম! পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলল রবি। ওয়ার্ড্রোব খুলল। সায়নের আয়া, সায়ন চলে যাবার পর আর ওয়াড্রোব্‌টা গুছোয়নি। রবির পোশাক রাখার তাক্‌ দুটো বিশ্রী এলোমেলো হয়ে আছে। ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা খুলে রাখা পাঞ্জাবি মাটিতে পড়ে গেল হাত ফস্‌কে। ঠক্‌ করে শব্দ হলো। রবি তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবিটা তুলে নিয়ে দেখল পকেটে একটা কালো ডায়েরী রয়েছে।

সেই ডায়েরীটা! কিশোরীবাবুর ঘর থেকে আনা। রবি এতদিন ভুলে গিয়েছিল ডায়েরীটার কথা। সেই আনন্দ সরকার। তিন নম্বর মদন নস্কর লেন, হাওড়া। রবি ডায়েরীটা বের করে ফুল ফোর্সে পাখা ছেড়ে দিল আজ। তারপর বেড লাইটটা জ্বেলে বিছানায় শুলো।

মলাটের রেক্‌সিন ম্লান, চুরচুরে। তৈলাক্ত ভাবটা কবেই চলে গেছে। জিনিসটাও তো কমদিনের নয়। রবির বয়স চব্বিশ। এটার বয়স তার চেয়েও তিনচার বছর বেশি। মলাটের ভেতর আনন্দ সরকারের নাম ধাম সব লেখা আছে। লোকাল অ্যাড্রেসের পরে একটু ফিকে রঙের কালিতে লেখা আছে, মাঝিনডিহি, সাঁওতাল পরগনা।

ভিতরের পয়লা জানুয়ারীর পাতাটা তো উৎসর্গেই গেছে। শানু'কে—কিশোরী। পয়লা জানুয়াবী ১৯৪৮ খৃঃ সন্ধ্যা, দিল্লী।

পাতা ওল্টালো রবি। প্রথম কয়েকপাতা আনন্দ সবকার ওরফে শানুর, খুদে খুদে অক্ষবে হিসেব। টুকিটাকি জিনিসপত্রেব হিসেব। তারপরে কয়েক পাতা হলদেটে। ড্যাম্প লাগানো। তারও পবে হঠাৎ করে লেখা শুরু। কুটি কুটি কবে লেখা। ডায়েবীর গায়ে ছাপানো নিজস্ব তাবিখ কেটে দিয়েছে শানু। কোণে লিখেছে ২৯শে মাচ। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দ। বাত একটা।

আজ সকাল বেলা মিছা আমাব বইএব তাক ঝাড়তে গিয়ে এতগুলো উইমাটি ফেলল। ভাগ্য ভালো বইগুলোয় উই লাগেনি। অবশ্য ওখানে ছিল কতকগুলো সস্তা ডিটেক্‌টিভ বই। উই ধবলেও তেমন ক্ষতি হত না। কিন্তু ওগুলোব সঙ্গে মিশে গিয়েছিল কিশোবীদার দেওয়া এই ডায়েবীটা। ডায়েবীটা আমার ঠিক এখন এই মুহূর্তে বড্ড দরকাব ছিল। কলমে কালি ভবতে গিয়ে দেখলাম কালির শিশিটা শুখিয়ে পড়ে বয়েছে। বিকেলে বহম টুডু শহবে গিয়েছিল তাকে দিয়ে কালি আনিয়েছি। মনেব মধ্যে কত কথা যে জমে উঠেছে। কাউকে বলতে পাবি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ভুলে যাবাব আগে লিখে বাখি। আজ কিশোবীদার দেওয়া এই ডায়েবী খুলে কিশোবীদাকেই খুব মনে পড়ছে। মনে পড়ছে দিল্লীব হোটেলের ঘবে বিছানায় মুখোমুখি বসে আছি আমরা দুজন। কিশোরীদা হঠাৎ বলল,—নীলকান্ত সবকাবেব ছেলে তুই, তুই এসেছিস দিল্লীতে কেবানীব ইন্‌টারভিউ দিতে? ছিঃ!

কিশোরীদার সেই ছিছিক্কারে অবশ্য আমি খুব একটা টলিনি। যদিও কিশোরীদাকে আমার খুব ভালো লাগে। ছোটবেলা থেকেই কিশোরীদা আমাদের হিরো। থাকতো আমাদের মদন নস্কর লেন থেকে দূরে, কিন্তু আড্ডা দিতে আসত আমাদের পাড়ায়। দারুণ সুন্দর চেহারা, গান বাজনা নাটকে ফার্স্টক্লাস। কিশোরীদাকে

আমাদের খুব ভালো লাগত। আমাদের পোড়ো ভিটে ছিল কিশোরীদাদের এজমালি ভিটের পাশে। ছোটবেলা থেকেই দেখছি বাবা ইনভ্যালিড্। আমাদের হেম নস্কর লেনের বাড়িটা দাদাই বানিয়েছিল। আমার বাবা মার আমরা দুই ছেলে। দাদার সঙ্গে আমার কুড়ি বছরের তফাত। দাদা ইঞ্জিনীয়ার, আর বাবা অনেক বছর জেল খেটে স্ট্রোক্ হবার পর ছাড়া পাওয়া রাজনৈতিক কর্মী। আমার দাদা বৌদিই সংসারের সব। মা থাকত সংসার থেকে আলাদা। বাবাকে নিয়েই ব্যস্ত। আমার দাদার দুই ছেলে যেন আমারই পিঠোপিঠি ভাই। আমি নামেই কাকা। ইকনমিক্সে এম. এ পাস করে দিল্লীতে এসেছিলাম চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে। সেখানে কিশোরীদার সঙ্গে দেখা।

কিশোরীদা আমার বাবার কাছে এসে বসত মাঝে মাঝে। আমাদের বাড়িতে জোরালো রেডিও ছিল। মনে আছে তখন যুদ্ধের সময় কিশোরীদারা রাতে চুপিচুপি আসত সুভাষ বোসের ব্রড্কাস্ট্ শুনতে। আগস্ট আন্দোলনের সময় দেখেছি বাবা কি ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়তেন। গান্ধীজীকে যেদিন মারা হলো সেদিন আমাদের বাড়ি হাঁড়ি চড়েনি। বাবাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখেছি একা একা। কিশোরীদা সেই বাবার কথা তুলে বসল হঠাৎ।

আমি হেসে বলেছিলাম,—কিন্তু কিশোরীদা, বাবার ছেলে হলেও দাদাকে তো সারা জীবনই চাকরি করতে হলো।

—বটুদার উপায় ছিল না। কে দেখত সংসারটাকে বল? তা ছাড়া বটুদার কত দায়দায়িত্ব। বৌছেলে রয়েছে। কিন্তু তুই—তুই তো ফ্রি···তোর বউ হয়নি ছেলে হয়নি। দে না জীবনটাকে ডেডিকেট্ করে।

কি আশ্চর্য? এ সব কথা কে বলছে? না কিশোরীদা! সেই কিশোরীদা। যে কিশোরীদা লক্ষ্ণৌ থেকে দিল্লী এসেছে এক বাঈজীর

মোসাহেব হয়ে। আর দিল্লী এসেই এক ভাটিয়া ব্যবসাদারকে মুরুব্বী করে দিব্যি তার পয়সায় খরচ-খরচা চালাচ্ছে।

ইণ্টারভিউ-এর পর দুদিন দিল্লীতে ছিলাম। সঙ্গে কিশোরীদা। শীতের দুপুরে লালকেল্লায় বসে বসে কিশোরীদা খালি বলত,—না রে, শান্নু আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না যে তুই সেই দশটা পাঁচটা করছিস। ওই সাইকেলের স্রোতে সামিল হয়ে টিফিন ক্যারিয়ার ঝুলিয়ে সেক্রেটারিয়েটে যাচ্ছিস আর বিকেলে আবার ফিরতি স্রোতে ফিরে যাচ্ছিস বাড়ি। তোর যা মাইনে হবে, তাতে পাবি তো একটা খুপ্‌রি। একটা ছোট বাক্‌স থেকে একটা বড় বাক্‌স···। ধ্যেৎ কৌটোর জীবন !

আমি চুপচাপ শুনতাম। আর মনে মনে ভাবতাম কেন কিশোরীদা আমাকে এ সব কথা বলছে। এসব কথার মূল্য আমাদের মত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের কাছে কতটুকুই বা ?

আমার বেশ মনে আছে মদন নস্কর লেনে বাড়ি তৈরী করার সময় দাদা একবার চমৎকার একটা কথা বলেছিল। দাদা বলেছিল, জানিস শান্নু, ছোটবেলা যখন নিজে একটা বাড়ি বানাবার কথা ভাবতাম তখন সবসময়েই মনে হতো, মস্ত বাগান করব, খোলা খোলা বারান্দা, বড় বড় জানলা দরজাঅলা দরাজ দরাজ ঘর। হাত পা মেলে, দারুণ আরাম করে থাকব। আর ত্যাখ্‌, এখন কেমন বাড়ি বানাচ্ছি সবটা জায়গা নিয়ে, যাতে সবচেয়ে ছোট ছোট, সবচেয়ে বেশি ঘর বানানো যায়। যাতে কোনো রকমে মাথা গুঁজে থাকতে পারি আর আষ্টেপৃষ্ঠে ভাড়া বসাতে পারি।···সত্যি এই-ই আমাদের জীবন। একেবারে রেডিমেড্‌, মাপে কাটা। কয়েকটা ডিগ্রি, একটা চাকুরি, একটা বাঁধা কয়েক স্কোয়ার ফিটের থাকার জায়গা। বৌ, ছেলেমেয়ে পেনসন এবং মৃত্যু !

কিশোরীদার একটা অন্ধধারণা আমার রক্তে নীলকান্ত সরকারের একটা সম্পর্ক আছে।

যেদিন কলকাতায় চলে যাচ্ছি, দেখলাম কিশোরীদা আকুল হয়ে ওর তোরঙ্গ হাতড়াচ্ছে। আমাকে বলল,—শানু দাঁড়া, তোকে আমি একটা ঠিকানা দেব।

আমি কৌতূহলী হয়ে ট্রেণে পাতা বিছানায় বসেছিলাম। কিশোরীদাকে অমন আকুল হয়ে কারো ঠিকানা খুঁজতে দেখিনি কখনো। অনেকক্ষণ উথাল পাথাল করবার পর ছোট্ট একটা সাদা বাইবেল বের করে আনলো। আমি দেখলাম কিশোরীদার মুখে আলো জ্বলে উঠলো যেন।

এই যে পেয়েছি। এই ঠিকানা। ফাদার প্যাট্রিক্। মাঝিন-ডিহি। সাঁওতাল পরগনা। তুই এই ঠিকানাটা নে!

আমি বাইবেলটা হাতে ধরে অবাক হয়ে তাকালাম কিশোরীদার দিকে। কিশোরীদা কিন্তু আমার চোখে চোখ মেলাল না। ঘাড় গুঁজে মাথা নিচু করে দৃষ্টি এড়াল।

কিশোরীদা আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত গেল। কামরায় গিয়ে বসল। মনে পড়ছে, ওর কাঁধে ছিল একটা লক্ষ্ণৌ-ই স্টিচের কাজ করা বাহারে ঝোলা। ঝোলা থেকে এই ডায়েরীটা বের করে দিয়ে আমায় বলল,—শানু, এ বছর এইটেই আমার সব সেরা ডায়েরী। এটা আমি তোকে দিলাম। তুই এটায় লিখবি। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তুই মাঝিনডিহি যেতে পারিস না? ওখানে ফাদার প্যাট্রিককে পাবি।

আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, আমি কেন মাঝিনডিহি যাবো? আমার কাজকর্ম নেই!

—না, তুই যাবি। তোকে যেতেই হবে!

কিশোরীদা তার একটি হাত আমার উরুতে রেখে চাপ দিয়ে এমন করে বলছিল যেন সমস্ত ব্যাপারটা একটা জীবন মরণের সমস্যা! আমি বুঝতে পারছিলাম না মাঝিনডিহির ফাদার প্যাট্রিকের জন্যে কিশোরীদার এত আকুলি-বিকুলি কেন?

খানিকটা বিরক্ত হয়েই নাছোড়বান্দা কিশোরীদাকে বলেছিলাম, —কিন্তু এত লোক থাকতে হঠাৎ মাঝিনডিহিতে আমি যাবো কেন কিশোরীদা? আমার গিয়ে কি লাভ?

—তুই যাবি, কারণ আমি যেতে পারিনি। আমি ফাদারকে কথা দিয়েছিলাম আমি যাবো। ফাদারের সঙ্গে মাঝিনডিহিতে গিয়ে কাজ করব। ফাদার প্যাট্রিক আমার ওপর অনেকখানি নির্ভর করেছিল। মাঝিনডিহিতে অনেকটা জমিও কিনেছিল ফাদার। ছোট্ট একটা চার্চ বানিয়েছিল। গরীব সাঁওতালদের মধ্যে কাজ করত ফাদার। কলকাতায় আমার সঙ্গে আলাপ হয়। ফাদার প্যাট্রিক তিলজলা বস্তিতে কাজ করত। আমিও কদিন জুটে গিয়েছিলাম তার সঙ্গে।

—বেশ তো, তুমি যখন বলছ, আমি না হয় তোমার প্যাট্রককে একবার দেখে আসতে পারি!

—ফাদার প্যাট্রিক!

কিশোরীদা, নামটা উচ্চারণ করতে গিয়ে যেন কি একটা ভয়ঙ্কর স্মৃতিকে মনে করে কেঁপে উঠল। আমি দেখলাম অত শীতেও কিশোরীদার মুখে ঘামের বিন্দু বিন্‌বিন করে উঠছে। আমার হাত চেপে ধরে কিশোরীদা চাপা গলায় বলেছিল, আমি ভীষণ পাপ করেছি রে শান্তু। ফাদারের সঙ্গে থাকব, ফাদারকে সাহায্য করব বলে কথা দিয়ে আমি খেয়ালের বশে ফাদারের সঙ্গে রওনাও হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু…কিন্তু ট্রেনেই ফাদারের গায়ে বসন্তের গুটি বেরোয়। আমি ফাদারকে একলা ফেলে রেখেই নেমে পালিয়ে যাই।

…আজ তাই কিশোরীদাকে খুব মনে পড়ছে। কিশোরীদা কে? কিশোরীদা কী? কিশোরীদা একটা নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু কিশোরীদার ওই একটি কথার জন্যেই তো আমি আজ এইখানে। সাঁওতাল পরগনার এই মাঝিনডিহি গ্রামে!

এখন এদের এখানে পাতা উৎসব। আমি যেখানে বসে লিখছি এটা আমার মাটির বাড়ির চওড়া মাটির পৈঠা। সামনেই জানলা। জানলায় এখন মোম জ্বলছে। ফাদার এই পৈঠাটাকে রাইটিঙ্ টেবিলের মত করে ব্যবহার করতে শিখিয়েছিলেন। কি মসৃণ এই গেরিতে নিকোনো মাটির অলিন্দটুকু। দিনের বেলা এই জানলা দিয়ে দেখেছি সাঁওতালি গ্রামের ছবির মত ছোট্ট ছোট্ট কুঁড়েগুলো। প্রথম যখন এসেছিলাম এত পরিচ্ছন্নতা আমার চোখে লাগত। এখন সয়ে গেছে। আমি আর এখানকার এই স্কুল এই ছোট্ট ডাক্তারখানা এই ফসল ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। শহরে তো নয়ই। মাঝিনডিহি এখন আমাব সব। এখন যদি দিনের বেলা হতো, আমাদের বেড়া দেওয়া জমির কিনাবায় লালে লাল কৃষ্ণচূড়া দেখা যেত। একটাও পাতা নেই। কালো ডালে শুধু থোপা থোপা লাল। ওই দূরে এখানে ওখানে আরো কত কৃষ্ণচূড়া লাল হয়ে থাকে নীল আকাশের তলায়, বহুদূর দেখা যায়, ঢেউ খেলানো জমি, মাঝে মাঝে কুঁড়ে, হঠাৎ সবুজ হয়ে থাকা খেত।

অবশ্য এখন এত বাতে এসব মিলিয়ে মিশিয়ে এক হয়ে গেছে। এখন এদের এখানে পাতা উৎসব। এই চৈত্র মাসে এরা পাতা উৎসবের গান বাঁধে। এই এত বাতেও, তারা কিচ্‌কিচে কালো আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে ওদের পাতা উৎসবেব গানের কলি। পরবে গাইতে হবে বলে ওরা কাছাকাছি কোথাও জড়ো হয়ে গাইছে। হাল্কা তুমদক্ তমক আর টিকারা বাজছে। হাল্কা মাদল। অদ্ভুত ঝুমুরেব টান লাগানো পাতা পরবের গান।

ইঞ্জ ঞেসতে দম বড় গদ—

অমদ অলঃ কড়া

অন্ধকারে মাঝিনডিহির রঙের বাহার ঠাহর করা যায় না। আকাশে হীরের কুঁচির মত তারা। চক্‌মক্ করতে থাকে। শুকনো পাতা পোড়ানোর শাদা ধোঁয়া কালো আকাশের দিকে সরু জল-

স্তম্ভের মত উঠে যেতে থাকে। আর সোঁদা গন্ধে আমার কুঁড়েঘর ভরে যায়। মোমের দপ্‌দপে আলোয় লিখতে লিখতে হঠাৎ আমার গলা কান্নায় বন্ধ হয়ে আসে। আমি একা একা মাথা নেড়ে বলি ফাদার প্যাট্রিক, আমি কথা দিচ্ছি আমি এ সব ছেড়ে আপনার কাছ ছেড়ে কোথাও যাব না। কোথাও না···আজ কিশোরীদাকে এত মনে পড়ছে যে ইচ্ছে করছে কিশোরীদাকে একটা চিঠি লিখি। যদি কিশোরীদার এখনকার কোনো ঠিকানা জানতাম হয়ত লিখতামও। লিখতাম,—কিশোরীদা, ওই দূরে অন্ধকারে মাঝিনডিহির শেষ টিলা পেরিয়ে ফাদার প্যাট্রিক তাঁর পছন্দকরা জায়গায়, কুর্চি গাছের তলায় শুয়ে আছেন। আজকেই আমরা তাঁকে সমাধি দিলাম। ফাদার বলেছিলেন কোনো বাঁধানো সমাধি যেন বানানো না হয়। আমরা বানাইনি। ফাদারের কথা মত ছোট্ট একটা কাঠের ক্রুশ শুধু···

কিশোরীদা এখনো কি তুমি দুঃখ পাও, তোমার বিবেক দংশন হয়? এখনো কি তুমি ফাদার প্যাট্রিকের সেই গুটিতে গুটিতে আচ্ছন্ন দেহটা দেখতে পাও আর শিউরে শিউরে ওঠো? আমি ফাদারের সেই দেহ দেখিনি। কিন্তু তোমার মুখ দেখেছিলাম। তাই ঠিকানা খুঁজে ঠিক চলে এসেছিলাম মাঝিনডিহিতে।···না, কিশোরীদা, ফাদার গুটি বসন্তে মারা যাননি। তাঁর সারা গায়ে ফোস্কার মত দাগ হয়ে গিয়েছিল শুধু। মাঝিনডিহি পৌঁছেছিলেন তিনি। সাঁওতালরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকা ফাদারকে গরুর গাড়িতে করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল মাঝিনডিহিতে। মিছার মা ভরম মেঝেন সাতদিন সাতরাত কাজে যায়নি। এক নাগাড়ে সেবা করেছিল ফাদারের। ফাদার ভালো হয়ে গিয়েছিলেন। কিশোরীদা তবু আমি মাঝিনডিহিতে তাঁকে দেখতে এসে আর ফিরে যেতে পারি নি। কারণ?···কারণ কিশোরীদার ফাদারকে আমি যখন দেখলাম তখন তাঁর হাতে একটা মোটা লাঠি। মিছা তখন নেহাতই একটি

বালিকা, তাকে ধরে ধরে হাঁটতে হয় ফাদারকে। গুটি বসন্তে ফাদারের চোখ দুটি মরে গেছে।

কিশোরীদা আমার তাই আর ফেরা হয়নি। আমি চাকরিব চিঠি পেয়েছিলাম কি পাইনি তার খোঁজও নিইনি। একবার শুধু বাবার কাছে গিয়েছিলাম তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে। বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। মা বলেছিল, তুই আমাদের জন্যে কিছু ভাবিসনে শান্তু, বড় খোকা বড বৌমা আমাদের ফেলে দেবে না।

বাবা মা দাদা বৌদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আবাব ট্রেনে উঠলাম। মাঝিনডিহিতে ফাদার প্যাট্রিকের কাছে ফিবে এলাম। কিশোরীদা, তারপর সুখে দুঃখে চারটে বছর কেটে চলে গেছে। তুমি কোথায় আছো তা জানি না। জানলে তোমায় এই মাঝিনডিহিতে নিয়ে আসতাম। ফাদার প্যাট্রিকের তৈরী এই জগতটাকে দেখাতাম। ছোট্ট স্কুল খুলেছিলাম আমরা। ছেলেরা কেউ আসত না। তারা বনে যেত মহুয়া কুড়োতে, ইঁদুর সাপ খরগোস শিকার করতে। কিন্তু পড়তে আসত না। প্রথম প্রথম এসে মনে মনে ভাবতাম এ একদল বুনো মানুষদের মাঝখানে এসে পড়েছি। সাঁওতালদের সম্বন্ধে এইত আমাদের মধ্যেকার প্রচলিত ধারণা। সেই সাতচল্লিশ খৃস্টাব্দে, দেশ যখন সবে স্বাধীন হয়েছে। তখন এই মানুষগুলোর কথা তেমন করে কে আর ভাবত। দু একজন সাধু-সন্ত কিংবা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ ছাড়া? কিন্তু আজ চার বছব এই মানুষগুলোর মধ্যে থাকতে থাকতে বুঝতে পেরেছি এরা কত ভালো! কত সরল কত নিষ্পাপ। যাক বিশেষণ দিতে চাই না কিশোরীদা। শুধু বলতে চাই এদের কাছে যদি তোমার একবার একঘণ্টার জন্যেও আসার সৌভাগ্য হত। হ্যাঁ, সৌভাগ্য! এসব কথা মুখে মুখে কপ্‌চিয়ে বোঝানো যায় না কিশোরীদা। এই মানুষগুলোর মনে যাতে লেখাপড়া শেখার

আগ্রহ জাগে, ফাদার সেই জন্যে এদের নিজেদের কি কাহিনী আছে, ইতিহাস আছে খোঁজ করে করে বেড়াতেন। আমিও ফাদারের সঙ্গে ঘুবতাম। বুড়ো সাঁওতালদের ঘরে গিয়ে গিয়ে পুরোনো সব নানান উপকথা কাহিনী সংগ্রহ করে এনে সাঁওতাল ছেলে মেয়েদের জন্যে ফাদার ছোট্ট ছোট্ট বই লিখতেন। ফাদার বলে যেতেন, আমি লিখতাম। তারপর সেগুলোর চারটে, ছটা কার্বন কপি বানাতাম।

ভিতবে ছবিও থাকত। সাঁওতালদের বাড়ির দেয়ালে যে সব ছবি আঁকা থাকে সেই সব ছবি। কাঁদন হেমব্রোম বলে একটি ছেলে ছবিগুলো এঁকে দিত। আর আমরা সেই চারপাতা, ছ'পাতার বইতে আঠা দিয়ে ছবি মেরে দিতাম। এইভাবে এদের অতীত কাহিনী এদের পুরোনো ইতিহাস শুনতে শুনতে আমার এত শ্রদ্ধা বাড়ল। আমি জানতাম না এরা আমাদের চেয়েও অনেক অনেক প্রাচীন সংস্কৃতির মানুষ। এরাই আদি ভারতীয়...

কিশোরীদা যদি তুমি কখনো আমার এই মাঝিনডিহির রাজত্বে আসো, আমি তোমায় আমার এই ছোট্ট কুঁড়েতে থাকতে দেব। ছোট্ট কুঁড়ে কিন্তু কত সুন্দর ব্যবস্থা। মিছা রোজ গেরিমাটি দিয়ে গোবর ছড়া দিয়ে সাবা ঘর লেপে দেয়। বাঁশেব উঁচু মাচানে আমার বিছানা। সারা ঘরে তাকের পর তাক। আমার বই। ওই বড় কাঠের বাক্সে আমার জিনিসপত্র। ভোরবেলা আমি ঘুম থেকে উঠতাম। উঠে পাশের কুঁড়েতে ফাদারের কাছে যেতাম। মিছা আমাদের চা বানিয়ে দিত। চা খেয়ে ফাদার আব আমি যেতাম ফুলডহরি। নদীর ধার ঘেঁষে খানিকদূরে। তারপরই বসত ভোরের পাঠশালা। দুপুরে ছেলেমেয়েরা পড়তে চায় না। বন এখনো ওদের মন আচ্ছন্ন করে আছে। ওরা বনে যাবেই। ইঁদুর ধরে পুড়িয়ে খাবে। নানারকম গাছের মূল তুলবে। পাতা কুড়োবে আরো কত কি! বেলায় ডাক্তারখানা খোলা হত। আমাদের ডাক্তারখানাটা মজার। এখানে হোমিওপ্যাথির ব্যবস্থা। ফাদার চালু করেছেন। পয়সায়

কুলোতে হবে তো! তবে এরা সরল মানুষ। নিষ্পাপ। রোগ আপনিই এদের শরীর থেকে সরে যায়। অল্প একটু আধটু হোমিও-প্যাথিতেই দিব্যি কাজ হয়। কিন্তু আমরা কাটাছেঁড়া এ সবের জন্যে এ্যালোপ্যাথি ওষুধপত্রও রাখি। আমি নিজে টিকে দেওয়া আর ইন্টারমাসকুলার ইঞ্জেকসন দেওয়াও শিখে নিয়েছি। ডাক্তার-খানার কাজ সেরে আমরা ক্ষেতে যেতাম। মাথায় বড় বড় টোকা পরে ফাদারকে নিয়ে গাছতলায় বসিয়ে দিতাম। আমি ক্ষেতের ভেতর ভেতর চলে যেতাম। কাজ করতাম। কাজ দেখতাম। তুপুরে মিছা আমাদের খাবার নিয়ে আসত। মোটা মোটা রুটি, রশুন দিয়ে শাকের তরকারী, পিঁয়াজ শশার স্যালাড্। আমাদের আশে পাশে সাঁওতালরা জড়ো হত। মাঝিনডিহির উন্নতির কথা হত। সমস্যাব কথা হত। ফাদারকে সবাই ভগবানের মত মানত। সন্ধ্যেবেলা আমরা কখনো নাচগান শুনতে যেতাম। এখনো ওরা আসে গল্প বলতে, শুনতে। কখনো বা আমি ঘুরতে বেরোই নানান কাজে। যে কাজে এক্ষুনি এক্ষুনি কোনো উপকার নেই কিন্তু হয়ত পরে কোনোদিন লোকের দৃষ্টি পড়বে। আমাদের সঙ্গে থাকে মারাং লিকি টুডু। টুডুই আমাদের এই সব নেশা ধরিয়েছে। তার বাড়ির দেওয়ালে আঁকা আছে উড়ন্ত হাঁসের ছবি। লিকি বলে ওই হাঁসের পিঠে চড়ে সাঁওতালদের মহান আদিপুরুষ এই বাংলাদেশে এসেছিল। লিকির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ওদের দেবতা ওদের রীতিনীতি গান উপকথা সব খুঁজে খুঁজে আনি। রবিবার আমাদের কাজের ছুটি।...ফাদার আমাকে একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছিলেন। সেটি নিয়ে যাই ছবি তুলতে। ওদের আঁকা দেয়ালের ছবি, দেব-দেবতার ছবি যে কত জমে গেছে।

ফাদার প্যাট্রিক, কোথায় ওয়েলসে তাঁর বাড়ি। এই সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে এসে মাঝিনডিহি গ্রামে আমরা তুজনে, তুজনের ছায়া হয়ে বেঁচেছিলাম। ফাদার চলে গেলেন। এখন

আমি কি করব? আমি কি একা! ভীষণ একা। মাঝিনডিহির এই সব কাজ চালাতে পারব?

ফাদার মাঝিনডিহিকে নিয়ে কত স্বপ্নই না দেখতেন। সপ্তাহে একদিন করে কাগজ আসত মাঝিনডিহিতে। রবিবারের কাগজ পৌঁছত বুধবারে। ফাদারের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর পড়তে হত। আমি জানতাম কোন খবরের জন্যে ফাদার কানখাড়া করে থাকেন। কাগজে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার কথা কি বলছে? আদিবাসী উপজাতি অনুন্নত মানুষদের কথা কি বলছে?...চাষবাস শিল্প এ সবের নতুন ব্যবস্থা কি হচ্ছে? জমিদার জোতদার মহাজনদের অত্যাচার থেকে এদের উদ্ধারের কি ব্যবস্থা হচ্ছে।...

ওদের এক টানা গান এবার থেমে এলো। যে যাই বলুক আমার কেমন যেন মনে হয় সাঁওতালী গানের মূল সুরখানি বিষণ্ণতার। হাজার হাজার বছরের অত্যাচার অবিচারের ছায়ায় ছায়ায় ওদের আনন্দের সুরের মধ্যেও দুঃখ কেঁদে বেড়ায়। একদিন সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়কার বানানো গান শুনিয়ে ছিল মামুয়া গাঁয়ের বুধনমাঝি। সেই গানের ভাষা থেকেই জেনেছিলাম সাঁওতাল নারী পুরুষ শিশুকে কি নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল এক কালে। সিপাহী বিদ্রোহেরও আগে স্বাধীন হবার জন্যে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল।

আসলে আমার জগতটা বড্ড ছোট হয়ে গেছে। বছরের পর বছর একটা গ্রামে থাকলে বোধহয় মানুষের মন এমন হয়ে যায়। মাঝিনডিহির মানুষ। মাঝিনডিহির মাটি। এর উন্নতি, এর ফসল, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা পরব আনন্দ সুখ-অসুখ ছাড়া আর কিছু অস্তিত্ব আমার কাছে আর নেই...ফাদার! ফাদার প্যাট্রিক এখন আমার বড় একলা লাগছে। বড় একলা। একলা।

ডায়েরীটা হাতে ধরে বসে রইল রবি।

রাত অনেক। ঘড়ির টিক্ টিক্ ছাড়া আর কোথাও কোনো শব্দ নেই।...পাতা উল্টে দেখল কয়েকটা ফাঁকা পাতার পর আবার লেখা শুরু হয়েছে। কিন্তু ক্লান্তিতে রবির শরীর ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। ডায়েরীটা বালিশের তলায় রেখে দিয়ে ববি বেড্‌সুইচটা নিভিয়ে দিল।

৭

ঘুম থেকে উঠতে খানিকটা বেলা হ'ল রবির।

সকালের তীব্র সাদা আলো চোখে বিঁধতেই রবি ধড়মড় করে উঠে বসল। বেশ বেলা হয়ে গেছে। আজ দিবানাথবাবুব সঙ্গে দেখা হল না। মধুরাব সঙ্গেও না। হয়ত মনে মনে আজ রবি দিনটাকে অন্যরকম ভাবে চেয়েছিল।

চায়ের টেবিলে এসে বসতেই ছোটমাসি বলল,—আয় রবি! বোস। আজ থেকে অফিসে বেরোবি। আজ তোর নতুন জীবন শুরু হল। হ্যাঁগো রবিকে নিয়ে এই মঙ্গলবার একবার দক্ষিণেশ্বর গেলে হয় না?

মেসো প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলল,—তা, হয়। মঙ্গলবার বেলা-বেলি বেরিয়ে পড়া যাবে। দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে একদম বেলুড় হয়ে…

মাসি আর মেসোব কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল। রবি চা খেতে খেতে ভাবল, মেসো তাকে এখন ঠিক কত করে দেবে? ঝণ্টুবাবুর বাড়ি থেকে মাকে সে ছাড়িয়ে আনতে পারবে কী? খোকাকে পড়াতে পারবে তো ভালো টিচার রেখে?

রূপু রবির পাশে বসে ছিল। সে চুপি চুপি রবির মাথার কাছে মাথা ঘেঁষিয়ে এনে বলল,—রোজ একটা করে পাখি কিনে ছেড়ে দিতে পারবে রবিদা? যদি টিফিনের পয়সা বাঁচাতে পারো?

রবি পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দেখল তার মনের মধ্যে থেকে যে সব কথা উঠ্‌ছে, যে সব ভাবনা উঠছে, সে সব তার নিজের কাছেই সম্পূর্ণ অচেনা। কি আশ্চর্য সেও সকালবেলা উঠে একবার

কালীবাড়ি যাওয়ার কথা ভেবেছে। নতুন শার্ট প্যান্ট করানোর কথা ভেবেছে, লাইফ ইনসিওর করানোর কথা, মায় চার বছর আগে এক জ্যোতিষীর বলা প্রবালের আঙ্‌টি করানোর কথাও ভেবেছে। টাকা পয়সা চাকরি, ট্যাক্সি, মিনিবাস, দোকান, নতুন বাড়ি, এসবের সঙ্গে জবার মালা, সিঁছুরের টান, কালীবাড়ির কি সম্পর্ক? পাথর দিয়ে সৌভাগ্য টেনে মুঠোয় ধরে রাখা—এসব চিন্তা রবি এর আগে কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি। বরং ভাবত, আচ্ছা মানুষ দেবতাকে কোন লজ্জায় এমন গেরস্ত করে তোলে?

অথচ তার মনের মধ্যে এগুলো বহুদিন থেকে, নাকি জন্ম থেকে নাকি জন্মেরও আগে থেকে স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছিল। রবি এই নতুন ভাবনাগুলোর ভিতবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে চলে বেড়াতে লাগল।

কেবল রবির মনে ছোটমাসির যার কথা মনে পড়েনি, ছোট মেসোরও না, শুধু তার কথাই জাগতে লাগল। সে মানুষটি তার মা। বার বার সেই আবছা মুখখানা রবি মুছে ফেলতে চাইল। বিষাদের জালে জড়ানো বিচিত্র একটি মুখ। কিন্তু পারল না। মা ঠিক মনের মধ্যে ফুটে আছেই।

অথচ এই মাকে রবি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না। অন্যের জাহাজ জাহাজ পাপও ক্ষমা করে দিতে পারে। কিন্তু মায়ের একতিল দুর্বলতাও রবির বুকে সারাজীবন বিঁধে থাকবে।

রবি ঠিক করে রাখল, আজ অফিস থেকে ফেরার পথে সে নিশ্চয় বাদামতলা লেনে যাবে।

মেসো বলল,—রবি এখন থেকেই খুব সিরিয়াস ভাব করছে দেখেছো নীপু?

ছোটমাসি বলল,—আমাদের ছেলেদের আমরা নিন্দে করি। আসলে জানো এরা কেউ নিন্দের নয়। এদের দায়িত্ব দেয়া হয় না তাই। আসলে এরা তো সবাই ভালো!

রবি হেসে বলল, বাঃ, ছোটমাসি তো দিব্যি বক্তৃতা দিতে শিখে গেছো।

হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। ছোটমেসো উঠে গেল ফোন ধরতে। সঙ্গে সঙ্গে ছোটমাসির মুখ থেকে রক্ত নেমে গেল। রবি দেখল ছোটমাসি একটি হাত বুকে রেখে, মেরুদণ্ড সোজা করে, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে টেলিফোনরত ছোটমেসোর দিকে। আর বিড়বিড় করে বলছে,

—কি জানি ? কিছু দুঃসংবাদ নয়ত। সায়নের ওখান থেকে ট্রাঙ্ককল ?···কোনো অ্যাক্সিডেণ্ট্ ?···আ-আমার বড় ভয় করছে।

ছোটমেসো ফোন নামিয়ে রেখে বলল,—পিনাকীবাবু ফোন করছিল একটা চালানের ব্যাপারে। খুব ভালো র-মেটিরিয়াল পাচ্ছি। বেশ ভালো কোয়ালিটির প্লাস্টিক। রবি যদি ব্যাপারটা ভালোমত বুঝে নিতে পারে, নতুন নতুন ডিজাইন বের করে মাথার ভিতর থেকে ভালো প্ল্যান্ দেয়, প্লাস্টিক উইঙ্‌টাকে তাহলে একটু এক্সটেণ্ড্ করার চেষ্টা করি।

মেসোর কথা মন দিয়ে শুনছিল রবি। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলল, প্লাস্টিকের ওপর সে পড়াশুনো শুরু করে দেবে আজ থেকে।

গাড়িতে উঠে বসতেই ড্রাইভার চাবি ঘুরিয়ে দিল। স্টার্ট। ইগ্‌নিশন ! সেই সঙ্গে যেন বাদামতলা লেন থেকে বেরিয়ে তাদের সেই কানাগলির দেড়খানা ঘর দুলতে দুলতে সূর্যমাখা একশো ফুট রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করেছে। ছোটমেসোর পাশে বসে রবি আনন্দে নিঃশব্দে হেসে উঠল।···তাদের সেই গলির বাড়িটা যেন চলন্ত গাড়ি হয়ে গেছে বলে জানালার চৌখুপী দিয়ে হঠাৎ রোদ, হঠাৎ শিরিষ ফুলের গোছা দেখে চমকে উঠে বসেছে বাবা। পড়ার বই থেকে চোখ তুলে একঝাঁক আলোর দিকে তাকিয়ে চোখ পিট্‌পিট্ করছে ছোট ভাই চন্দ্র। বোন লতু তো আনন্দে তালি দিয়ে উঠ্‌ছে

—আর মা উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টলে টলে পড়তে পড়তে বলছে—কে? কে এমন করল? রবি, রবি নিশ্চয়ই আমার রবি···মা হাসছে! আনন্দে হাসছে···

ষড় বাজারের সরু লেনের মধ্যে ঢুকেছে গাড়িটা। একটা অ্যামব্যাসাডর ঢুকলেই লোককে দেয়াল ঘেঁষে হাঁটতে হয় এত সরু। একটা পুরোনো ভ্যাপসা গন্ধ। শ্যাওলা, জমাট বেঁধে থাকা ময়লা আর ড্রেনের কালো জলের। মেসোর অফিস ছোট্ট। একটি টেবিল তিনটি চেয়ার কটি স্টীলের বড় বড় আলমারি আর ওইটুকুর মধ্যে ছুটি ফ্যান্। রবি অবাক হয়ে ভাবল, বাব্বা এইটুকুতেই এত। এই নোঙ্‌রা বদ্ধ জায়গায় পা বসাতে পারলেই কলকাতার পশ্ এরিয়ায় মস্ত ব্যাপার! হাওয়া আলো টাকা পয়সা বিদেশে বেড়ানো নরম বিছানায় শোওয়া এইসব···এখন রবির এলেমের ওপব সব নির্ভর করছে।

রবি মনে মনে জানে ব্যবসাপত্তরের কূটবুদ্ধি তার আছে। এ লাইনে তার ভাত কেউ মারতে পারবে না।

পিছনের ছোট্ট একটা খুপরির দরজা খুলে বেরিয়ে এল পিনাকী-বাবু!

ছোটমেসো ফ্যান্ খুলে দিয়ে চেয়ারে বসে বলল,—অখিল আর মুনেশ্বরপ্রসাদ কোথায়.?

—ওরা দুজনেই বিল লাগাতে বেরিয়েছে স্যার!

—ধীরেনবাবু?

—তিনি খিদিরপুরের কারখানায় গেছেন!

রবি বলল, বাবা, কি রেগুলার কাজকর্ম করছে এখানে?

—হ্যাঁ মোটামুটি। তবে শরীর তো তেমন ভালো না। মাঝে মাঝে একটু-আধটু অসুবিধাও হয় ধীরেনবাবুকে নিয়ে। সে যাক্‌গে —পিনাকীবাবু, আপনিই একটু কষ্ট করে চায়ের কথা বলে দিন না পাশের দোকানে!

পিনাকীবাবু চলে গেলে ছোটমেসো রবির দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল,—ড্রিঙ্কটা তো কিছুতেই ছাড়ানো গেল না। কারখানাতেও মাঝে মাঝে চলে। ওঁকে ঠিক বাইরে-টাইরেও পাঠানো যায় না। এ বয়সে হিল্লী দিল্লী করা সম্ভবও নয়। তাই তো তোমাকে আরো ভার নিতে হবে রবি। সব কাজ খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নিতে হবে।

সারাটা দিন কাটল ছোটমেসোর সঙ্গে অফিসের খাতাপত্র বুঝে নিতে। দুটি ছোট কারখানা ছোটমেসোর। একটি রবারের, একটি প্লাস্টিকের। কারখানা ছোট। খিদিরপুর আর তিলজলায়। কিন্তু প্রচুর অর্ডার। বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রির সঙ্গে কনট্রাক্ট্। রবারের ছোট ছোট অংশ, প্লাস্টিকের নানারকম পার্টস-এর বড় অর্ডার। ছোটমেসো এখন ব্যবসা আরো বাড়াতে চায়। সে সব প্ল্যান নিয়েও রবির সঙ্গে আলোচনা হল।

বিকেলে ছোটমেসোর ফোন এলো। কোন বন্ধু ডাকছে। দমদম এয়ারপোর্টের কফি কর্নারে আড্ডার নেমন্তন্ন। ছোটমেসো প্রায়ই যায়। ওই কফি কর্নারের আড্ডাটা তার খুব পছন্দ। মেসো বলল, চলো তোমায় বাড়ির কাছাকাছি ছেড়ে দিয়ে আমি এয়ারপোর্টে চলে যাই। রবি যেতে চাইল না। সে বলল, আমি আর একটু থাকি। কাগজপত্র দেখি। তারপর ফিরব। আসলে মেসো চলে গেলে রবি মায়ের কাছে যাবে। মায়ের পা ছুঁয়ে একবার প্রণাম করতে—দারুণ লোভ হচ্ছে তার। মায়ের ফাটা ফাটা ময়লা সেই দুঃখী দুটি পা।

ছোটমেসোর গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই পাশের খুপ্রি থেকে বেরিয়ে এল পিনাকীবাবু। ততক্ষণে অখিল ফিরে এসেছে। দরজার সামনের টুলে মুনেশ্বরপ্রসাদও হাজির। পিনাকীবাবু রবির কাছে এসে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলল,—আমার ওই খুপ্রিটা আপনি একবার দেখলেন না রবিবাবু। পাখা নেই। জানলা-টানলা তো

কিছু নেই। বড় কষ্ট হয়। আপনি বলে কয়ে একটা পাখা করিয়ে দেবেন।

অখিল গাল চুলকোচ্ছিল। অল্প বয়স। ভেঙেপড়া একটা চেহারা। সে ভাঙা গলায় বলল,—আর সেই গোবিন্দ মুন্‌সীর কথাটা···সেটা বলেন দাদাবাবুকে···

—হ্যাঁ, গোবিন্দ দার্জিলিঙের কাছে, বাবুর কাজে যেতে গিয়েই পা পিছলে খাদে পড়ে গেল। তার কমপেনসেসন্‌টা···

—কে গোবিন্দ মুন্‌সী ?

—সে বাবুর বিশ্বাসী লোক। আপনার বাবারই তো ওই কাজে যাবার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত বাবু বলল, বড্ড নেশা করে। থাক দরকার নেই···

রবির চোয়াল ক্রমশ শক্ত হয়ে আসছিল। পিনাকীবাবুকে না হয় একটু-আধটু চেনে রবি। কিন্তু এই অখিল টখিল ! এদের সাহস তো কম নয়। জানে, রবি মালিকের আত্মীয়, তবু মালিকের নামে নিন্দে করছে। নাকি এইটাই নিয়ম। এ সব শুনে যেতে হয়। গায়ে মাখতে নেই।

রবি সাড়ে ছটা নাগাদ বাইরে বেরুল। পিনাকীবাবুর তখনো অনেক টাইপের কাজ। অখিল আর মুনেশ্বরপ্রসাদ অফিসের সামনে বসে বিড়ি খাচ্ছিল।

থিক্‌থিকে ভিড় ঠেলে রবি এগোল। চারিপাশে মানুষ। মানুষ আর মানুষ। অনেকদিন এত ব্যস্ততা রবি এ ভাবে, এত কাছ থেকে দেখেনি। মানুষগুলোর মুখ টান টান। পেশি দোমড়ানো ! কোথাও পৌঁছোতে কিছু পেতে কি আকুলতা। রবিও এমনি আকুল হতে চায়। জানতে চায় এই সব রাস্তা শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে থাকলে, সততা থাকলে কোথাও, কোনো বড় রাস্তায় পৌঁছে দিতে পারে কি না ?

এটা একটা চ্যালেঞ্জও। সবাইকেই কি দিবানাথবাবুর মত

হতেই হবে ? এছাড়া কি আর কোনো রাস্তা নেই। রবি বশ্বাস করে না। কপালের ওপর একগুচ্ছ চুল এসে পড়েছিল রবির। ঝাঁকানি দিয়ে চুলটা সরিয়ে দিয়ে রবি নিজেই নিজেকে বলল, আমার বয়স এখন চব্বিশ বছর।

চব্বিশ বছর! চব্বিশ বছর! তার মনে পড়ল, কাল আর একজন চব্বিশ বছরের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে তার। তার নাম আনন্দ সরকার। শান্নু। মাঝিনডিহি।

অন্ধকারে ঠাহর করা যাচ্ছে না কিছু। লোড্ শেডিং। রবি গলিতে ঢোকবার আগে ছুটো মোমবাতি কিনে নিল। গলির মুখে কেমন পচা ফলের তীব্র একটা গন্ধ। ঝাঁঝ। কতকগুলো লোক জটলা করছে। আজকাল বস্তির ঘরে ঘরে চোলাই মদের ব্যবসা। পিছনে ঝুম্‌ঝুম করে ঘুমুরের একটা শব্দ হ'ল। শস্তা সেণ্টের একটা চেনা গন্ধে রবি বুঝতে পারল চিনুও বাড়ি ফিরছে। চিনুর শরীরে কোথাও ঘুমুর লাগানো কোনো গয়না আছে। রবি বলল, কি চিনু, কেমন আছো ?

অন্ধকারে চিনু একটু চম্‌কে উঠল। তারপর খুশি।

—রবিদা না ? বাঃ বেশ হ'ল। বাড়িতে যাচ্ছ ? রবি বলল, হ্যাঁ।

—সময় থাকে তো এস না আমাদের বাড়ি। চিনুর গলায় আগ্রহ ফেটে পড়ছিল। চিনুর কথাও রবির খুব জানতে ইচ্ছে করে।

রবি বলল,—তুমি এখন কি করছ ?

—কি আর করব। ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। লেখাপড়া তো হ'ল না। ছুট্‌কো-ছাটকা কাজ। এখন একটা মেয়েদের ব্লাউজ ফ্রকের দোকানে সেল্‌স গার্লের কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে ছোড়দি।

ছোড়দি বোঝে না রোজ সন্ধ্যে আটটা পর্যন্ত থাকতে আমার কত খারাপ লাগে।

—তা তুমি পড়াশুনো করো না কেন?

—রবিদা, এটা তুমি কি বললে? একেবারে জ্যাঠামশাইদের মত কথাবার্তা হল না? মুড্, মেজাজ, বয়স আমার চারপাশ তুমি দেখতে পাও না? মনে হয় যেন পালিয়ে চলে যাই কোথাও।

চিনুর গলি এসে পড়ল। গরমে গলির মুখে মুখে এসে দাঁড়িয়েছে মানুষজন। চিনুর দু একটা দিদিও। রবি তাদের এড়িয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

চৌকাটে একটা হোঁচট খেয়ে রবি বাতি জ্বালল। বাতির আলোয় পর্দা সরিয়ে দেখল ঘর খালি। মা নেই, ভাই বোনেরাও না। বাবার খুপরির চটের ও পাশ থেকে জড়িত গলায় কে যেন বলল,—কে?

রবি তাড়াতাড়ি পর্দা সরিয়ে ঢুকে দেখল বাবা উপুড় হয়ে তক্তপোশের ওপর পড়ে আছে। বন্ধ ঘরে সেই পচে ওঠা টকে ওঠা ফলের গন্ধ।

—মা কোথায় গেছে! চন্দ্র? লতু?

বাবা কষ্ট করে চোখ খুলে বলল,—তোর চাকরি হয়েছে খবর পেয়ে দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে গেছে!

—আমি চাকরি পেয়েছি কে বললে মাকে?

—আমি বলেছি! আমাকে পিনাকীবাবু জানিয়ে দিয়েছে।

এখন তাহলে আর কোনো 'পর্দা' রইল না!

রবি দেয়ালের দুপাশে দুহাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাতিটা টুলে বসানো। পুরোনো বাড়ি। কি কারণে এই আলাদা এক-জানলাওয়ালা ঘরটা বানানো হয়েছিল কে জানে? তবু খোপটা আছে বলে বাবাকে একটু আলাদা রাখা যায়। বাবা, বাবার কাশি, হাঁপানি, নেশা, রেসের বই আর নোংরা গালাগালি। বন্ধ জায়গার মধ্যে

গন্ধটা প্রবল হয়ে আসছিল। বাবার তোবড়ানো মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চুলটা লেপটে আছে কপালে। জীর্ণ শরীরটা তালগোল পাকিয়ে বিছানায়। মাথাটা তোলা। এ ঘরে আর কিছু ধরার জায়গা নেই।

—আমি তা হলে এখন যাই। একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসি।

রবির বাবা বলল,—যাবি, যা—

রবি চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ কেমন যেন আর্তস্বরে ধীরেনবাবু ডাকল,—এ্যাই রবি, শোন্,—শুনে যা—

রবি ফিরে এল।

রবির বাবা ততক্ষণে টলতে টলতে উঠে বসেছে। রবি দেখল বাবার চোখদুটো বেরিয়ে আসছে যেন। একটা হাত তুলে আঙুল দেখিয়ে বলল,—তুই—তুই প্রণবকে বাঁচিয়ে দিয়েছিস শুনলাম—সত্যি? হ্যাঁরে? সত্যি?

রবি বাবার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

—মানুষকে বাঁচিয়ে দেওয়া খুব পুণ্য। খুউব ভালো কাজ! রবি দেখল চৌকির পাশে একটা বড় সাইজের বোতল রয়েছে। বোতলটা একদম খালি। রবির বাবার চেতনা ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। এরপর কথা সম্পূর্ণ জড়িয়ে যাবে। তারপর জ্ঞান চলে যাবে। এসব দৃশ্যে রবি খুব অভ্যস্ত। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো। মোমবাতির শিখা কাঁপছে। বাবার জীর্ণ শরীরটা আক্ষেপে বেঁকে বেঁকে উঠছে। কালো আর খয়েরী আভা ধরা দেয়ালে ছায়া নাচছিল দুজনের। রবি ঘৃণায়, মমতায় তার বাবার পিঠে আর বুকে হাত দিয়ে শুইয়ে দিতে গেল। রবির ছোঁয়ায় কোনো জাদু ছিল কিনা কে জানে! কেমন যেন চম্‌কে উঠল রবির বাবা। তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, মানুষকে বাঁচিয়ে দেওয়া খুব পুণ্য কাজ। আমি জীবনে একটা মানুষকেও বাঁচাইনি। আমার বংশেও কেউ বাঁচায়নি। রবি তুই এক কাজ কর, আমি তো পারব না।

আমার তো শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে। তুই বরং তোর মেসোকে বাঁচিয়ে দে—

—মেসোকে ?

—হ্যাঁ, তোর মেসো ক্রমশ মরে যাচ্ছে। ওকে তুই বাঁচিয়ে দে। ছাখ্না তক্তপোশের তলায় কি আছে ছাখ্ !

রবি আস্তে আস্তে বাবার খোলা চোখের পাতা বন্ধ করে দিল। কষের পাশ দিয়ে পাছে গাঁজলা বেরোয়, তলার চোয়ালে হাত দিয়ে ঈষৎ হাঁ-করা মুখটাও বন্ধ করে দিল। এ ভাবেই জ্ঞান-হীন পড়ে থাকবে কয়েক ঘণ্টা ! রবি জানত। তারপর বাতিটা নিয়ে তক্তপোশের তলা থেকে টেনে বের করল একটা স্যুটকেস। দামী স্যুটকেস। লক্ ভাঙা। রবির মনে পড়ল, মা বলেছিল পিনাকীবাবু মাঝে মাঝে রবিদের বাড়ি ব্যবসার মালপত্র রেখে যায়। কিংবা এমনও হতে পারে তার লোভী বাবাকে স্যুটকেসটা মেসোই রাখতে দিয়েছিল। বাবা হয়ত লক্ ভেঙে দেখার কৌতূহল সামলাতে পারেনি। বাক্সের ডালা খুলে ফেলে রবি হতবাক। অনেকগুলো বিদেশী ঘড়ি আর একটা চামড়া বাঁধানো অ্যালবাম্। অ্যালবামে একটা রঙীন মোটর গাড়ির ছবি। কাছ থেকে। দূর থেকে। ভিতর থেকে বাইরে থেকে। প্রায় সব কটি কোণ থেকে ? কেন ?
—কেন ?

বাক্সটা বন্ধ করে রবি উঠে দাঁড়াল।

ছুটো কারখানা। একটা রবারের। একটা প্লাস্টিকের।

হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল মেসোমশাই। তারপর ফেঁপে ফুলে এই এতটা বড় মানুষ।

রবি বুঝতে পারল ছোটমাসি সব সময় এত ভয় পায় কেন ?

ছোটমাসি সব জানে। সব জেনেও লোভ ছাড়তে পারে না। দু হাতে লোভ আঁকড়ে তটস্থ হয়ে থাকে।

ছোটমেসো পিনাকীবাবুকে জড়িয়ে নিয়েছে অনেককাল। বাবাকেও জড়িয়েছে কিছুদিন হল। এবার রবিকে।

স্যুটকেসটা বন্ধ করল রবি। দড়ি দিয়ে বাঁধল ভালো করে। একটা পুরোনো বাক্সের কভার পরিয়ে হাতে নিল। তারপর জ্বালানো বাতিটার পাশে আর একটা আস্ত নেভানো বাতি রেখে সে বেরিয়ে পড়লো।

রবির বুকের ভিতর একটি কথা বন্ধ খাঁচার পাখির মত আপসাল ঝাপসাল করছিল। হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের ভিতরেই সেই কথাটা বাজাতে লাগল।—মুন্নি, মুন্নিরে, তুই পাখি উড়িয়ে দিয়েছিলি। তোর পুণ্য হয়েছিল। তাই তুই গাঁয়ে ফিরতে পেরেছিলি। আমি প্রণবকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। আমার বাবা বলেছে আমার পুণ্য হয়েছে, আমি কি সেই পুণ্যের সুদে আরো পুণ্য করতে পারব না ?

গলির মুখে এসে বুক ভরে নিশ্বাস নিল রবি। হাঁটতে হাঁটতে সে এলো কদমতলার স্টপে। অন্ধকারে মুখ ডুবিয়ে আছে অলকের শহীদ বেদীটা। অলককে কি শহীদ বলা যায়। না অসহায় শিকার ? ভুল করে নিষ্পাপ একটা ছেলেকে যারা মেরে ফেলে তারা ঠিক কারা ? তারা সত্যি কি এই দেশটাকে ভালোবাসে ? তাহলে তারা রবিকে না মেরে অলককে না মেরে, এই স্যুটকেসের ভেতর দিয়ে যারা পাপ ফেরি করে তাদের দেখে নিতো। তাদের দিকে ভুল করেও তো একটি বোমা ছুঁড়ে মারল না ? অলক শহীদ নয়। অলক এমন একটা সময়ের, এমন একটা পরিবেশের অসহায় শিকার যখন কেউ-ই জানে না যুদ্ধটা কেন ? যুদ্ধটা কার বিরুদ্ধে ? কেবল চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধের মত পরের কথা শুনে, ভুল নিশানা করে, ভাঙচুর করে। তারপর অনুতাপে আঙুল কামড়ে মরে। কেবল দল বদলায়। পতাকা বদলায়। তারপর শেষ পর্যন্ত চলে যায় সুবিধাবাদীর তাঁবুতে।

বাসে উঠে স্যুটকেসটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বসল রবি। হুহু করে চলছে বাস। হাওয়া। প্রাইভেট্ বাসের মিটমিটে আলো। বেশি ভিড় নেই।

একথা ঠিক নয় যে তার বাবা কিছু জানত না। তার বাবা সবই জানত। বাবাকে তো দার্জিলিঙ্-এ পাঠানোর কথা হয়েছিল, যে কাজে শেষ পর্যন্ত গোবিন্দ মুন্সী বলে একটা লোককে পাঠানো হয়েছিল! যে পা পিছলে নিচে খাদে পড়ে যায়। যাকে কোনো কমপেনসেসন দেওয়ার কথা মেসোর মনে আসেনি। তাই ছোট মাসি এত ভয় পায়। সত্যি এত পাপ, এত অন্যায় করা সত্ত্বেও দিব্যি বেরিয়ে যাচ্ছে ফ্যামিলিটা। পার পেয়ে যাচ্ছে। অথচ ক্ষতি হচ্ছে গোবিন্দ মুন্সীর মত লোকের। আজ গোবিন্দ, কাল পিনাকী, পরশু রবির বাবা, তার পরের দিন রবি···

হঠাৎ কি হয়েছিল বাবার? বাবা কি মদ খেয়ে নেশা করে দুর্বল হয়ে পড়েছিল? সারাজীবনে রবি বাবাকে কখনো একটা মানুষের মত কাজ করতে দেখেনি। তবে আজ? নাকি মদ খেয়ে বাবার ভিতরের বিবেকের একটা দরজা হঠাৎ খুলে গিয়েছিল যে···বাবা আসল জিনিসটা ঠিকঠাক দেখতে পেয়েছিল। সত্যিই তো ছোটমেসো যে জীবন কাটায় সেটাকে কি বাঁচা বলে। কিংবা ছোটমাসি যে ভাবে বেঁচে থাকে?—সত্যিই ছোটমেসো মরে যাচ্ছে! এক পলকের জন্যে এ ভাবে আসল সত্যিটা দেখতে পাওয়াটাও কি একবিন্দু পুণ্য!

শুধু বাস চলছে না। রবি দেখল তাদের বাদামতলা লেনের সেই কানা অন্ধগলিটাও সত্যিই কেঁপে কেঁপে চলতে শুরু করেছে। রবির চাকরি থাকুক আর চাকরি যাক্ তার তোয়াক্কা গলিটা আর করে না। রবির শুধু একটি দুঃখ মনের মধ্যেই রয়ে গেল। আজ বড় বাজার থেকে বেরোবার সময় বড় আশা করে সে ভেবেছিল সে প্রমাণ করবে ঠিক পথে থেকেও সফল হওয়া যায় কিনা। সেটা

বোধহয় আর চৌধুরী কোম্পানীর অফিসে বসে কাজ করে প্রমাণ করা গেল না।

বাস থেকে নামতেই সামনে পড়ল মধুরা। মার্‌কারি ল্যাম্পের নীল্‌চে আলোয় তার একটু তুলে ধরা মুখের মসৃণ ত্বকের রঙ সবুজ লাগছিল। তার ঠোঁটের রঙ ঘোর খয়েরী। মধুরার পরণের শাড়ির রঙও ঠিক পানের পিচের মত।

রবি নেমে দাঁড়িয়ে হাসল। মনে মনে বলল,—মধুরা আজ সকালে তোমাকে আর দিবানাথবাবুকে আমি দেখতে চাইনি। আজ আমি নতুন একটা জীবন আরম্ভ করতে চেয়েছিলাম। আসলে বোধহয় আমাদের মনের মধ্যে অনেক তলায় অনেক নিচে কতকগুলো বোধ, কতকগুলো ইচ্ছে থেকে যায়। আমরা বোধহয় বুঝতে পারি ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে। তাই সে রাস্তার যারা কাঁটা, যাদের সঙ্গে আমার মত, পথ মিলবে না তাদের ছেঁটে ফেলতে চাই।

মধুরা, আমি কি জানতাম। সত্যিই ভিতরে ভিতরে জানতাম যে কাজে আমি যাচ্ছি সে কাজের রাস্তা বাঁকা। রাস্তা ঠিক নয়।

মধুরাও হাসল। রবির কাছে এগিয়ে এসে বলল,—

—কি ভাবছেন?

রবি মাথা ঝাঁকিয়ে কপালে পড়া চুলে আঙুল চালিয়ে হেসে বলল,—

—নাঃ, কিছু না!—আপনি এত রাতে?

হাতঘড়ি দেখে নিয়ে মধুরা বলল,—এমন কি রাত? ন'টা বেজেছে মাত্র। আমি মাস্টারমশাইকে বাসে তুলে দিতে এসেছিলাম।

রবি স্যুটকেস হাতে এগোলো।

—আপনার মাস্টারমশাই আবার এসেছিলেন?

মধুরা রবির পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল,—

—আপনাকে একটা কথা বিশ্বাস করে বলতে পারি? শুক্‌নো গলায় রবি বলল,

—বলুন!

—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে মাস্টারমশাই ঠিক নর্মাল নেই আর! আমি আর বেশি বলতে চাই না। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন মাস্টারমশাইকে আমি কখনো ঠিক ওই চোখে দেখিনি!

রবি চুপচাপ হাঁটছিল। মধুরা মাথা নিচু করে হাঁটছিল। ক্রমশ তারা আলোর আওতা পেরিয়ে অন্ধকারের দিকে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ মধুরা বলল,—

—আপনিই বলুন, কোনো মানুষের এই এত অকৃত্রিম···একে কি করুণা করা যায়, দয়াই করা যায় শুধু? আপনি বলুন তাতে কি পাপ হয় না?

রবি চুপচাপ হাঁটছিল। তার মনে হচ্ছিল সে আর মধুরা যেন দুটো একসময়, একবয়স, পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। নাহলে একদিনের আলাপে এত সহজে এত ভিতরের কথা কি করে বলা যায়?

—বলুন, পাপ হয় না?

রবি দাঁতে দাঁত চেপে রুদ্ধ গলায় বলল,—হয়!

মধুরা একটা নিশ্বাস ছাড়ল।

রবি এবার মধুরাকে মনে করিয়ে দিতে চাইল,—

—কিন্তু আপনি তো কলোনীতে ফিরে যাবেন। আমার সঙ্গে অন্যদিকে চলে আসছেন কিন্তু!

মধুরা আশে পাশে তাকিয়ে বলল, তাই তো! খেয়াল করিনি! আপনি কোথায় যাচ্ছেন এখন?

—ওই যে দূরে আলো দেখা যাচ্ছে, একতলা বাড়ি! ওখানে। সেই লাঠি হাতে বুড়ো ভদ্রলোক—যাঁর সঙ্গে রোজ সকালবেলা বেড়াই।

—আচ্ছা! বুঝেছি। তাহলে আমি ফিরি। আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না। কষ্ট হয়। তবু মাস্টারমশাইয়ের জন্যে বলতে হবে। আমাদের বাড়ির সকলের ধারণা আমিই মাস্টারমশাই এর···

···চলি!

মধুরা কথার শেষটুকু কেটে দিল। ফিরে হাঁটতে শুরু করল সে। একটু যেন তাড়াতাড়ি। রবি তাকিয়ে রইল তার দিকে। মধুরা মিথ্যে বলতে পারে না, মধুরা অশালীন কথা বলতে পারে না, মধুরা মানুষের মনে কষ্ট দিতে পারে না, মধুরা কারো ভালোবাসা নিয়ে হাসাহাসি করতে পারে না, মধুরা পাপ করতে পারে না।

দূরের আলোর ঘেরাটোপের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এক সময় ছোট অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল মধুরা। রবি ফিরে হাঁটতে লাগল দিবানাথবাবুর ঘরের আলোর ফোঁটাটিকে নিশানা করে।

ঝিঁঝির শব্দ উঠছে। কচুরিপানায় ভরা ঝিলের পাশের মেটে বাড়ি থেকে ভেসে আসছে ট্রানজিস্টারে হিন্দি গানের সুর। রবির চোখের সামনে মধুরার সেই গঙ্গামাটি রঙের মুখটা ফুটে উঠছে। সেই ভেজা খয়েরী ঠোঁট। মধুরা সম্বন্ধে কথাগুলো এভাবেও তো ভাবা যেতে পারে।

মধুরা সত্যি কথা বলে,—

মধুরা পবিত্র—

মধুরা মানুষকে সুখী করতে চায়—

মধুরা ভালোবাসাকে সম্মান দিতে জানে—

মধুরা পুণ্য করে।

রবি যখন দিবানাথবাবুর বাড়ির সামনের কাঠের গেট খুলে ঢুকল তখন তার মনে হ'ল তার চারিদিকে মৃদু ঘণ্টা বাজছে। মাথার ওপরে যেন পুণ্যের করুণ একটি চাঁদোয়া।

৮

রবি যখন নতুন কলোনীর ছোটমাসীর বাড়ির বেল্ বাজালো তখন তার কব্জিতে ছোটমেসোর দেওয়া ফরেন ঘড়িতে রাত এগারটা ঝক্ঝক্ করে জ্বলছে। দিবানাথবাবু তাকে কয়েকটা দিন এ বাড়িতে কাটিয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। চট্ করে এক স্যুটকেস চোরাই মাল নিয়ে থানায় জমা দিলে শেষ পর্যন্ত কিছু খাড়া করা যাবে কিনা সন্দেহ।

দরজা খুলে দিল যোগিয়া। ছোটমাসি সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল। বুকের ওপর হাত রেখে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল ছোটমাসি।

—কি রে রবি? এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি বলত? আমার এত ভয় করে?

রবি অবাক হয়ে তাকাল। তার মানে রবিকেও ছোটমাসি তার সংসারের সঙ্গে ধরে নিয়েছে আজ থেকে। কারণ এর আগে কখনো রবির জন্যে ভয় করেনি ছোটমাসির। রবির জন্যে ভাবেনি।

রবি বলল,—কেন? মেসো এখনো ফেরেনি।

—উনি এই মাত্র এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করলেন। এইবার আসছেন···আশ্চর্য রবি তোদের কোন বিবেচনা নেই আমার জন্যে? তোরা কেউ বুঝিস না আমার কি ভয় করে। খালি মনে হয় এই বুঝি কি হ'ল, এই বুঝি কি হ'ল! বল্ এভাবে ভয়ে আতঙ্কে বাঁচা যায়?

দাঁতে দাঁত চাপল রবি। ছোটমাসির চিবুকের তলাটা এমন একটা লাবণ্যে টলটল করে! মনে মনে বলল, ছোটমাসি তোমার

সব ভয় সব আতঙ্ক এবার শেষ হয়ে যাবে। তোমার সংসারকে বাঁচাবার জন্যে একটা ঘোরতর বিপদ দরকার।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে নিচের সোফার ওপর রূপুর ডল পুতুলটা চোখে পড়ল। রূপুর কোমল মুখ। এই বাড়ি, এই ঘর, এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্য···রূপু তো ছোট্ট, রূপু তো কোনো দোষ করে নি। রবির মাথার ভিতর রূপুর কথা রূপুর আদর রূপুর ছোঁয়া দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল।

নিজের ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর দেখল রবির নাম লেখা একটা খাম। সায়ন চিঠি লিখেছে। সায়ন। এক সঙ্গে এক ঘরে থাকতে থাকতে দারুণ বন্ধু হয়ে গিয়েছিল।

দরজার কাছে এসে ছোটমাসি বলল,—কিরে বললি না অফিস কেমন লাগল।

—খুব ভালো। কিন্তু এখনো তো কিছু তেমন জানতে বুঝতেও পারলাম না।

ছোটমাসির চোখে একটা বিচিত্র আলো জ্বলে উঠলো।

—জানতে বুঝতে হবেই তোকে। তোর ওপর সব ভার পড়বে গিয়ে। আমি তোর মেসোকে আজই বলে দেব তোকে যেন কাজকর্ম ভালো করে বুঝিয়ে দেয়! আমি শুতে যাচ্ছি। তুই তাহলে খেয়ে নিস।

রবি সায়নের লেখা খামটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইল। তার সারা মন তখন কথা বলছিল। বলছিল ছোটমাসি তোমার হাত কাঁপে না? ছোটমেসোকে জিজ্ঞেসও করো না কি ভাবে, কোথা থেকে তোমাদের এত এত টাকা আসে? নাকি তুমিও সব জানো। তুমিও পাপী!

. নিজের দুঃখী নিঃসহায় শেষ হয়ে যাওয়া বাবা মায়ের জন্যে রবির বুক চিরে একটু নিশ্বাস বেরিয়ে এলো।

আনন্দ সরকারের ডায়েরীটাই খুলে বসল রবি। তার চোখ অনিদ্রায়

আলা করছিল। ডায়েরীর পাতার ছাপা তারিখ কেটে আলাদা তারিখ লেখা।

১৯শে জানুয়ারী,—

১৯৫৮।

আমার বাক্স বিছানা গোছানো হয়ে গেছে।

মাঝিনডিহি থেকে চলে যাচ্ছি। মিছা এখনো কিছুতেই আমায় ছেড়ে গেল না। দেওয়ালে ঠেশ্ দিয়ে ঝিমোচ্ছে বসে! আর আমি লিখছি।

আমার মাঝিনডিহি গ্রাম। অন্ধকারে শীতে কুয়াশায় হিমে আবছা হয়ে আছে। কিশোরীদার জন্যেই এই গ্রামে এসেছিলাম। আজ কিশোরীদার জন্যেই গ্রাম ছেড়ে আমায় চলে যেতে হচ্ছে।

যখন এসেছিলাম মাঝিনডিহিতে তখন আমার বয়স ছিল চব্বিশ। এখন আমার বয়স চৌত্রিশ পূর্ণ হয়ে গেছে। ফাদার প্যাট্রিক চলে গেছেন আজ ছ বছর হ'ল। আমি যখন মাঝিনডিহিতে এসেছিলাম তখন যে সব বাচ্চারা জন্মেছিল তাদের এখন দশ বছর বয়স। যে সব ছেলেমেয়েদের আমরা স্কুলে পড়িয়েছিলাম তারা এখন যুবক-যুবতী। সময়ের এই ব্যবধানে কত নতুন নতুন কুটির হয়েছে, কত জঙ্গল সাফ্ হয়েছে। আমাদের মাঝিনডিহি থেকে খোয়ার রাস্তা তৈরী করে আমরাও যেমন এগিয়ে গিয়েছিলাম মহকুমা শহর থেকে পাকা রাস্তাও তেমনি এগিয়ে এসেছে আমাদের দিকে।

এখন গাঢ় অন্ধকার। দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দিনের বেলা হলে দেখাতাম আমাদের মাঝিনডিহিতে লেখালিখি করে টিউবওয়েল বসানো গেছে। চাষের জন্য নালা কাটা হচ্ছে। বড় ক্যানাল কাটা হবে, বাঁধ দেওয়া হবে বড় নদীতে। সরকারের লোক এসে সব দেখেশুনে গেছে।

আমাদের মাঝিনডিহি। সেই ছোট্ট গ্রাম। কেবল ফাদার প্যাট্রিকের ছোট্ট চার্চ আর স্কুলের চারপাশে ঘুরে বেড়াতো বাইরের

জগতের—একটু-আধটু হাওয়া। এখন এখানে বসেছে হাসপাতাল। ছোট্ট একটি হাসপাতাল যদিও একজন ডাক্তার দুজন নার্স নিয়ে। আর ছোট্ট একটি প্রাইমারী স্কুল।

ফাদারের জমি বাড়ি সবই আমাকে ট্রাস্ট করা। কিন্তু আমি চলে যাচ্ছি। এই সব ফসলের জমি এখন থেকে অনেক বেড়ে গেছে। গোশালা করেছি। আমাদের এখন পাঁচটি গরু। পোলট্রি আছে। খোঁয়াড় আছে। হাঁস মুরগি ছাগল। মেয়েরা এখান-কার গাঁয়ে কাঁথা সেলাই চাটাই বোনা এ সব করে। তার জন্যে ছোট আটচালা করেছিলাম। এ সব আমি মিছাকে দিয়ে যাচ্ছি। মিছা দেখবে। মিছা আমার জন্যে ঠায় বসে আছে। প্রথম যখন আসি ও তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে। দেখাত দশ এগারো। এখন ওর চব্বিশ বছর বয়স।

মিছা বোধহয় আমায় ভালোবাসে।

বছর দুই আগে আমাদের মাঝিনডিহিতে ছোট্ট হাসপাতাল খোলা হ'ল। একজন বাঙালী ডাক্তার এলেন। আর দুজন নার্স। ডাক্তারবাবুর বয়স হয়েছে। তিনি হয়ত দু-একবছরের মধ্যে চলে যাবেন। একজন নার্স অমিয়াদি। তিনি দিনের বেশির ভাগ সময়েই গাঁয়ে পড়ে থাকার জন্য।

আর আমি?

আমি কি নতুন হাসপাতালের নার্স সুজাতাকে ভালো বেসেছিলাম!

কিশোরীদা যদি কোনোদিন মাঝিনডিহিতে ফিরে আসে তাহলে আমার এই ডায়েরীটা মিছার কাছে থাকবে। যেন কিশোরীদা পড়ে। এটা কেবল কিশোরীদার জন্যেই লিখে রেখে গেলাম।

যেদিন প্রথম আমাদের হাসপাতাল খোলা হ'ল, ডাক্তারবাবু এলেন, রমাদি এলেন, আর এল সুজাতা। হাসপাতালের দুখানি

বড় বড় পাকা হল ঘর। টালির চাল। ভিতরে এ্যাস্‌বেস্টসের ফল্‌স সিলিঙ দেওয়া। ছোট্ট একটি অপারেশনের ঘর পর্যন্ত।

ডাক্তারবাবুর জন্যে মাটির দোতলা বাড়ি বানিয়ে দেওয়া হ'ল। নার্সদের জন্যেও তাই। তাঁদের জন্যে এই প্রথম গাঁয়ে স্যানিটারি বাথরুম পর্যন্ত বসানো হ'ল। হাসপাতাল উদ্বোধন করার সময় বড় শহর থেকে এসেছিলেন ফাদার প্যাট্রিকের কয়েকজন পুরোনো বন্ধু। তাঁরা কথা দিয়ে গেলেন হাসপাতালের জন্যে একটা বিদ্যুৎ জেনারেটর দেবেন।

বিদ্যুৎ!

ফাদারের কতদিনের স্বপ্ন আমাদের মাঝিনডিহিতে বিদ্যুৎ আসবে। সত্যিই আসছে। আমি নিজে দেখে এসেছি। মহকুমা শহর থেকে মেটালড্‌ রোড ধরে বিদ্যুতের পোস্ট এগিয়ে আসছে। মাঝিন-ডিহিতে বিদ্যুৎ আসবে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠবে। পাম্প চলবে। আর দুঃখী ভাইবোনেরা আনন্দ করবে। ফসলের গান গাইবে। সোহরাই সোরেনের সুরে ভরে যাবে আকাশ। আমার মাঝিনডিহির সাঁওতাল ভাই সোহরাই সোরেঞ বড় ভালো গায়! বড় ভালো গায়।

সুজাতা এলো ভরা ফাল্গুনে। মনে আছে, একদিন মাঠ থেকে সোজা চলে গিয়েছিলাম শালবন পেরিয়ে আরো গভীর বনে। সুজাতাও আমার সঙ্গে ছিল। সুজাতাকে নিয়ে গিয়েছিলাম আমার প্রিয় একটা জায়গা দেখাতে। হঠাৎ বনের মাঝখানে কয়েকটা পলাশ গাছ। সবুজের মাঝখানে একেবারে আগুনে আগুন। মাঝে মাঝে কয়েকটা বড় বড় কালো পাথর। তার ওপর দিব্যি বসা যায়। আর তাদের গা ঘেঁষে এঁকেবেঁকে শুকনো একটি নদীর ধারা। আমি আর সুজাতা দুটো পাথরে মুখোমুখি বসেছিলাম। সুজাতা সুন্দর নয়। কালো। কিন্তু তার চেহারায় একটা কম বয়সের জাদু ছিল। সুজাতা খুব চুপচাপ থাকত। গম্ভীর। ফাদার

প্যাট্রিককে সে দেখেছিল। ফাদার প্যাট্রিকের সঙ্গে কলকাতার বস্তিতে, অনেক অজ পাড়াগাঁর গ্রামে সুজাতা কাজ করেছে। তাই সুজাতা এই গ্রামের হাসপাতালে আসার জন্য এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিল।

সুজাতার সেবা, সুজাতার নিষ্ঠার পাশে ডাক্তারবাবু আর রমাদির কাজকর্ম ছিল অর্ডারি। মাপজোক করা। প্রাণহীন। রমাদি তো প্রায়ই ছুটি নিয়ে সুজাতার ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিয়ে শহরে চলে যেত। ডাক্তারবাবুও রাত-বিরেতে ডাক্তারি ব্যাগ নিয়ে দুমাইল তিন মাইল হেঁটে রোগী দেখতে যেতে চাইতেন না। কিন্তু সুজাতা আশ্চর্য। সুজাতা এক পায়ে খাড়া। শুধু হাসপাতালের কাজ কেন, আমাদের স্কুলের কাজ, চাষের কাজ, মেয়েদের হাতের কাজের মহিলা আশ্রম—সবেতেই সুজাতার উৎসাহ।

সুজাতা যেন আমারই মত চিরকাল থাকবে বলে মাঝিনডিহির এই হাসপাতালে এসেছিল। ক'মাসের মধ্যেই তার বাগান ভরে উঠেছিল ফুলে ফুলে। সে আমার বাড়িতেও বুনো মাধবীলতা বসিয়ে দিয়েছিল।

আমরা দুজন সেদিন চুপচাপ বসেছিলাম। কোনো কথা বলিনি। ফেরার সময় সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। বন পেরিয়ে উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো রাঙামাটির জমি পেরিয়ে আমরা গ্রামে ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ সুজাতা বলেছিল,—চলুন না ওই কুর্চিগাছটার তলায়। ফাদারকে একবার প্রণাম করে আসি।

ফাদারের সমাধির সামনে বসে দুহাত জুড়ে প্রার্থনা করেছিল সুজাতা। অনেকক্ষণ।

আমি বলেছিলাম,—কি ফাদারের সঙ্গে অনেক কথা হ'ল মনে হচ্ছে।

সুজাতা হেসে বলেছিল,—হ্যাঁ! সত্যি। ফাদারকে বললাম, ফাদার, তোমার এই গ্রাম, এই গ্রামের বিকেল, এই কুর্চিগাছ, পলাশ

বন, শালের সারি, গাঁয়ের কুঁড়েঘর—সব সুন্দর। আমি যেন উদ্ধার হয়ে যাচ্ছি।

এক বছর এভাবেই কেটে গেল। ডাক্তার বদল হ'ল। সিনিয়র নার্স বদল হ'ল। শুধু থেকে গেল সুজাতা।

মিছা তখনো আমার কাছে আসত, দেখাশোনা করত। আমার রান্না করে দিত। ঘর গুছিয়ে দিত। আমার বাড়িতে রাণীর মত ঘুরে বেড়াত আর হয়ত সুজাতা আর আমাকে গল্প করতে দেখে কথা বলতে দেখে আড়ালে কাঁদত। কিন্তু মিছা পড়াশুনো করত। মন দিয়ে আমাদের সব কাজ দেখাশুনো করত।

একদিন ঘোর বর্ষায় বাড়ি ফিরে দেখি সুজাতা আমার বিছানায় শুয়ে আছে। সুজাতাকে আমি এমন কোনোদিন দেখি নি। সেকি অঝোর বৃষ্টি! আমাদের কুঁড়েটা যেন সারা পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে গেছে। আকাশের অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে আমাদের ঘরের কোণে কোণে। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ভিজে মাটির, জলের, ভেজা খড়ের, লতাপাতায় কি আশ্চর্য সোঁদা গন্ধ।

সুজাতা বালিশে বুক দিয়ে, গালে হাত দিয়ে বৃষ্টিই দেখছিল। আমাকে দেখে সে উঠে বসল না। পায়ের খানিকটা ওপরে উঠে যাওয়া শাড়িও ঠিক করল না। যেন সে এ ঘরেই থাকে। শোয় বসে। এ ঘরের মানুষের সঙ্গে তার অনেক দিনের সম্পর্ক। আমি খানিকটা ভিজে গিয়েছিলাম। মাথা মুছে পোশাক বদলে একটু দূরে একটা মোড়ায় বসেছিলাম। সুজাতা হঠাৎ উঠে বসে বলল, শোনো,—

আমি অবাক হলাম। সুজাতা কখনো আমাকে তুমি বলে না।

আমি মাথা তুলে বললাম,—কি ব্যাপার কি? হঠাৎ 'তুমি'-তে নামলে যে?

আমাকে অবাক হতে দেখে সুজাতা হেসে বলল, তোমার যে

চরিত্রবল আছে জানি। বৃষ্টির দিনে একা ঘরে তুমি যে কারো মত দুর্বল হয়ে পড়ো না, তাও জানি। কিন্তু—

আমি অল্প একটু হেসে বলেছিলাম, কিন্তু কি? সুজাতা বলেছিল, কখনো কখনো এইখানে দুর্বল হয়ে পড়ো তাই না?

সুজাতা তার বুকের তলায় পেষা বালিশের তলা থেকে আমারই তাকে রাখা চিঠির প্যাড্‌টা বের করে মেলে ধরল আমার দিকে। তাতে কি লেখা ছিল আমি জানতাম। একটা পাতার ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত কেবল সুজাতা, সুজাতা, সুজাতা···তারপব হঠাৎ তলায় 'আমি আর একা থাকতে পারছি না।'

আমি উঠে সুজাতার হাত থেকে প্যাড্‌টা কেড়ে নিতে গেলাম। সুজাতা সেটা নিয়ে তখন ছেলেমানুষি করছে। তার সেই গাম্ভীর্য সেই শান্ত ভাব আর ছিল না।

আমি শান্ত থাকতে পারিনি।

আমাদের যখন খেয়াল হ'ল দেখি বৃষ্টি ধরে গেছে। মিছা মাথার টোকাটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পরনের শাড়ি থেকে অঝোরে জল ঝরছে।

কদিন পরেই মাঝিনডিহির আইনে আমাদের ধুমধাম করে বিয়ে হ'ল। বিয়েতে আমি সুজাতাকে একজোড়া তাঁতে বোনা মোটা শাড়ি দিয়েছিলাম। তার একটা সুজাতা মিছাকে দান করে দিয়েছিল।

আমরা এক বছর বড় সুখে বড় শান্তিতে ঘর করেছিলাম। তারপর তুমি এলে কিশোরীদা। খুঁজে খুঁজে দেখতে এলে তোমার ছুঁড়ে দেওয়া ঠিকানায়, তোমার ফাদার প্যাট্রিকের জনসেবার কাজ শানু করছে কিনা?

কিশোরীদা তখন আমি জানতাম না তোমার সঙ্গে সুজাতার আগে আলাপ ছিল। আমি জানতাম না তোমাকে পাগলের মত ভালোবাসত বলে সে তোমার হদিস করতে করতেই এই মাঝিন-

ডিহিতে এসেছিল। কারণ সে শুনেছিল ফাদার প্যাট্রিকের কাজ একজন বাঙালীই চালায়। কিশোরীদা হয়ত সুজাতাকে যখনই তোমার গল্প বলেছি তখনই ভাগ্যদোষে ছিল অন্ধকার আমি তার মুখ দেখতে পাই নি। কিন্তু ভালোবাসা জিনিসটা এমন কিশোরীদা অবোলা জন্তুরাও তার ভালোবাসার জনের সব কিছু বুঝে যায়। তাকে বলে দিতে হয় না।

যে মুহূর্তে তোমার আর সুজাতার দেখা হয়েছিল সে মুহূর্তেই আমি সব বুঝে গিয়েছিলাম। আমি বুঝেছিলাম হয় সুজাতা আমার ওপর দয়া করেছে। করুণা করেছে। না হলে, সে তার শরীরের দুর্বলতা এড়াতে পারে নি। আমার ভালোবাসার সুযোগ নিয়েছে।

কিন্তু আমি কিছু বলিনি। কিশোরীদা, শুধু জ্বলেছি। নিরুপায় জ্বালায় জ্বলেছি। তোমাদের যন্ত্রণা দেখেছি। তবে তোমার আর কি কষ্ট। আজ তুমি মাঝিনডিহিতে আছো, আজ তোমার কাছে সুজাতাই সব। কাল আবার লক্ষ্ণৌ গেলে তুমি জর্দনবাঈ-এর সর্বস্ব। কিশোরীদা, তুমি কারো মত নও তুমি শুধু তোমার মত।

আমি জানতাম, তুমি যতদিন থাকবে, আমাকে কেবল তোমাকে সহ্য করে যেতে হবে। কিন্তু আমি সুজাতার কথা জানতাম না। আমি বুঝতে পারিনি, সুজাতার সমস্ত জগৎটাই তোমাকে দেখে কতখানি পালটে গেছে। ওর যেন খালি মনে হচ্ছে এই মাঝিনডিহি গ্রামটা একটা বদ্ধ কুয়োর মত। আর কিশোরীদা, তুমি যেন সমুদ্রের খবর নিয়ে আসা মস্ত জাহাজ !

কিন্তু কিশোরীদা, তুমি সুজাতার মনে বড় দুঃখ দিয়েছিলে। আর অপমান করেছিলে আমাকেও। সাঁওতাল পাড়ায় তুমি হাঁড়িয়া খেতে যেতে। হাঁড়িয়া খেয়ে বেহুঁশ হয়ে তুমি ওদের নীচের মত গালাগাল করতে। ওদের মেয়েদের দিকে হাত বাড়াতে কিশোরীদা, এ লোভী উচ্চবর্ণদের স্বভাব। ওদের বলবে

নীচু। ছোট। আবার ওদের ঘরের মেয়েদের টেনে নিয়ে গিয়ে বলবে মেয়েছেলের আবার জাত কূল কি। ওদের পরিচয় ওদের দেহে। যৌবনে।

কিন্তু আমাদের মাঝিনডিহি ফাদার প্যাট্রিকের গ্রাম। মারাং লিকি টুডুর গ্রাম। লেখাপড়া জানলে লিকি টুডু খুব বড় পণ্ডিত হতে পারত। সাঁওতালি উপকথা, গান, ইতিহাস লিকি টুডুর মত খুব কম মানুষই জানে। এ গাঁয়ের মানুষদের আত্মমর্যাদাবোধ বড় তীব্র। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় এই লিকির পূর্বপুরুষ মারাং হড়ম টুডুকে দড়িতে বেঁধে ঘোড়ার সঙ্গে জুতে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে সারা মাঝিনডিহি, ছনমগুরা, বনডহরি ঘুরিয়ে তারপর গুলি করে মারা হয়েছিল। তবু মাঝিনডিহির মারাং বংশ মাথা নোয়ায় নি। বছরের পর বছর মহাজনেরা ঋণের জালে জড়িয়ে এদের পুরুষ পরম্পরায় ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে, তাও সয়েছিল দাঁতে দাঁত চেপে। সাঁওতাল বিদ্রোহের পর সব ক্রীতদাস ক্রীতদাসীরা পালিয়ে ছিল পুবের পাহাড় জঙ্গলে। তবু নেমে এসে ধরা দেয় নি। সাহেব অফিসার সৈন্য সেপাইদের অত্যাচারে কত মেয়ের প্রাণ গেছে, কত বাচ্চা মারা গেছে, তবু এরা সাহেবের পায়ে মাথা নোয়ায় নি। কিশোরীদা, সাঁওতালরা সব সয়, কিন্তু নারীর অপমান সয় না।

আমার মাঝিনডিহির মানুষরা আমার মুখ চেয়ে তবু তোমাকে সয়েছিল। কিন্তু কিশোরীদা, একদিন হাঁড়িয়া খেয়ে নেশার মুখে শালবনের সন্ধ্যায় আলো-আঁধারিতে তুমি মিছাকে অপমান করলে শুদ্ধা কুমারী মিছাকে। ভয়ে লজ্জায় মিছা লুকিয়েছিল পলাশ বনের পাশে পাথরের আড়ালে দুদিন দুরাত। বনের মধ্যে মিছার ছেঁড়া শাড়িটা পড়েছিল।

আমরা সবাই মিছাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। সুজাতাও ছিল। মিছার রক্তের ছিটে লাগানো শাড়িটা দেখে চম্‌কে উঠে-ছিল সে। আমিও চম্‌কে উঠেছিলাম। চম্‌কে উঠেছিলাম সুজাতার

পরনের শাড়িটা দেখে। মিছার শাড়ির জুড়ি যেটা। সেই আমার বিয়ের সময়কার দেওয়া শাড়ি।

তাহলে কিশোরীদা, সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে তুমি কি মিছাকে সুজাতা ভেবেছিলে ?

সুজাতা আর আমি মৃতপ্রায় মিছাকে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। গাঁয়ের মানুষজন চারিদিকে দাঁড়িয়েছিল। তাদের চোখ জ্বলছিল। তাদের হাতের লাঠি সড়কি ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছিল কিন্তু তারা কেউ একটা কথাও বলে নি। শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। দেখতে চেয়েছিল আমি কি করি।

আমি আর ডাক্তারবাবু আর সিনিয়র নার্স যখন মিছাকে নিয়ে ব্যস্ত, তখনই সুজাতা পালায়। সে বুঝতে পেরেছিল এদের হাতে তোমার আর রক্ষে নেই। কিশোরীদা ! এরা তোমায় শেষ করে ফেলবে। সমস্ত গ্রাম যখন হাসপাতালের চারপাশে ভেঙে পড়েছে, তখন কিশোরীদা, আমার সংসার শূন্য করে আমাদের এতদিনের এত কষ্টে গড়ে তোলা মাঝিনডিহির শান্তি সম্প্রীতি চুরমার করে ভেঙে দিয়ে তোমরা চলে গেলে। রাত শেষ হয়ে এলো। বাতাসে শেষ রাতের গন্ধ। দূরে গরুর গাড়ির ঘণ্টা ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। বাস রাস্তায় ফিরে যাবার গাড়ি আসছে।

আজ অনেক দূরে চলে যাচ্ছি কিশোরীদা। বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে। অন্য একটি রাজ্যের এক খনি অঞ্চলে সামান্য একটা খাতা লেখার চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছি। মাঝিনডিহিতে আর আমার ঠাঁই হ'ল না কিশোরীদা। এখানে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিশ্বাস ফিরে তৈরী করার শক্তি আর আমার মধ্যে নেই।

যেখানেই তুমি থাকো কিশোরীদা, আমি জানি, আবার একদিন তুমি এই মাঝিনডিহিতে ফিরে আসবেই। যেদিন আসবে সেদিন যদি এখানকার মানুষেরা তোমায় চিনতে পারে, তাহলে আমি জানি না তোমার ভাগ্যে কি লেখা আছে। তবে এইটুকু জেনে রেখো

মিছা কোনোদিন তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। মিছার মধ্যে সে শক্তি আছে। সে লেখাপড়া জানে। হিসেব রাখতে জানে। ব্যাঙ্ক থেকে সই করে টাকা তুলতে পারে। তাকে আমি ফাদারের গবেষণার কাগজপত্র ভরা বাক্সগুলো বুঝিয়ে দিয়ে গেছি। সে হয়ত সেগুলো ছাপানোরও ব্যবস্থা করবে একদিন।

আমার স্থির বিশ্বাস আমার মাঝিনডিহি একদিন বড় হবে। বদলে যাবে। আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে। তুমি যদি কোনোদিন মিছার কাছে যাও, সে তোমায় এই ডায়েরীটা দেবে। আমি তাকে বলে গেছি।

কিশোরীদা, আমার মাঝিনডিহির স্বপ্ন আমি অনেক দূরে বসে রোজ দেখব। আর তোমার ওপর রাগতে গিয়েও রাগতে পারব না এই ভেবে, যে তুমিই তো সেই অদ্ভুত মানব-সাধকটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে। যাঁর মাটির কবরের ওপর দুলছে ফুলে ফুলে ছাওয়া রূপসী একটা কুর্চিগাছ।

ডায়েরীটা বন্ধ করল রবি। মাথায় ঠেকিয়ে নমস্কার করল হঠাৎ। তারপর লঘুপায়ে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে ছাদে। রাতের আকাশের তলায় মাথা পেতে একা দাঁড়িয়ে রইল, যেন তাব মাথার উপর সমস্ত আকাশের আশীর্বাদ ঝবে ঝবে পড়বে।

ভোর রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রবির। নিচে ক্রমাগত ফোন বাজছে। ছোটমাসির ওষুধ-খাওয়া ঘুম। উঠে পড়লে বুক ধড়ফড় বাড়বে। রবি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ফোন ধরল। রবি যা ভেবে-ছিল তা নয়। ছোটমেসোর কোনো ট্রাংকলও নয়। সুজাতাদি ফোন করছে হাসপাতাল থেকে। কিশোরীবাবুর লিভার থেকে ক্রমাগত ব্লিডিং হচ্ছে। অবস্থা খারাপ। রবি দেখল ছোটমাসি এসে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছে। তার চুলগুলো রাক্ষসীর মত একঢাল। আলুথালু। ছোটমাসির বুকে হাত রাখা। গলার স্বরে উৎকণ্ঠা

'কিরে রবি? কি হয়েছে? আমায় বল। ভয়ে আমার হাত পা সিঁটিয়ে আসছে। কে ফোন করছে এত রাতে!'

রবির সমস্ত ভিতরটা কেমন অস্বাভাবিক ঘৃণায় দুলে উঠল। সে দেখল ছোটমেসোও নিজের ঘর থেকে উৎকণ্ঠিত মুখে বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ চিৎকার করে বিকৃত গলায় রবি বলে উঠল,—দার্জিলিং থেকে গোবিন্দ মুন্সী বলে একটা লোক ট্রাঙ্ক করছিল ছোটমেসোকে। সে একটা ভারি রকম কমপেনসেসন চায়···

কথাটা বলবাব পর রবি আর দাঁড়াল না। হাসপাতালে যাবার জন্যে তৈরী হতে ছোটমাসির পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠে গেল।

৯

কিশোরী মিত্তিরকে নিয়ে ছদিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানি চলল। তিনদিনের দিন অনেকটা সামলে উঠল কিশোরী মিত্তির। জ্ঞান হ'ল। কথা বলতে পারল। ব্লিডিংটাও বন্ধ হয়েছে। সুজাতাদি আর আলোকে নার্স-কোয়ার্টারে বিশ্রামের জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে রবি একা বসে আছে। ছোট্ট চিলতে কেবিন। জানালা দিয়ে খানিকটা ছাইরঙা চোঁয়ানো আলো গড়িয়ে পড়েছে ঘরে। কোণে কোণে জমে থাকা বহুদিনের রোগ আর মৃত্যুর গন্ধের ওপর ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো।

কিশোরী মিত্তিরের মুখটা এত সুন্দর লাগছে। যেন কুঁদে পালিশ করা সাদা মার্বেল পাথর গড়া। চোখ ছটি বন্ধ। মাথার ঈষৎ দীর্ঘ থোপা থোপা চুলগুলো বালিশের ওপর মেলা। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে রবির মনে পড়তে লাগল আনন্দ সরকারের কথা। কিশোরী মিত্তিরের দিকে ফিরে তাকাল সে। কি আগাগোড়া নিরর্থক, ক্ষতিকর একটা মানুষ!

অথচ কি সুন্দর! জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রবি। সামনেই একটা তিনতলা উঁচু হাসপাতাল বাড়ি। তার পিছনের ফাটা মরচে পড়া নল দিয়ে ক্রমাগত জল চুইয়ে পড়ছে।

এইখানে, এই নিরানন্দ ছোট্ট একটা খোপের মধ্যে শুয়ে রয়েছে মানুষটা। সারাজীবন যাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে একটা স্বেচ্ছাচারের ভূত। কিশোরী মিত্তিরকে এই হাসপাতালের বিছানায় মানায় না।

অনেকক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে চোখ খুলল কিশোরী মিত্তির। রবি মাথার কাছে বসে ছিল। রবিকে তাই দেখতে পেল না।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল কড়িকাঠের দিকে। তারপর একটা ভারি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তোর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, —আপনার কিছু চাই? জল খাবেন?

নিচু গলায় কিশোরী মিত্তির বলল,—নাঃ। তারপর হাত বাড়িয়ে রবির হাতটা ধরে বিছানায় বসতে বলল। কিশোরী মিত্তিরের হাত ঠিক মেয়েমানুষের মত নরম লতানে। ধবধবে ফরসা। রবির হাত তার মুঠোর মধ্যে কালো লাগছিল। কালো আর শুক্‌নো। কিশোরী মিত্তির রবির হাত ধরে চুপচাপ পড়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বলল,

—জানো রবি, আমার হাতে শেষ কথাটা কি লেখা আছে। ভরা সংসারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সকলকে রেখে আমি রাজার মত চলে যাবো। অথচ ছাখো, আমার সংসারই হ'ল না।

রবি বলল, আপনি কথা বলবেন না বেশি। কষ্ট বাড়বে। চুপ করে শুয়ে থাকুন।

কিশোরী মিত্তির তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল, যেন রবির কথাটা উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়।

রবি আবার বলল,—ডাক্তারবাবু বলেছেন আপনার বিপদ কেটে গেছে। আজ বিকেলে রক্ত দেবেন। সাত-আট দিনের মধ্যে আপনি বাড়ি যাবেন।

আবারও হাসল কিশোরী মিত্তির। তারপর বলল, জীবনটা কেমন যেন কেটে গেল, না? এখন আমার পঞ্চাশ পার হয়ে গেল। এই পঞ্চাশটা বছরে কি আর করলাম। জানো রবি, আমার জীবনটা কেমন যেন এলোমেলো আজেবাজেভাবে খরচ হয়ে গেল!

রবি বলল,—জানি। কিন্তু সেজন্যে আপনি কি আর কাউকে দোষী করতে চান?

কিশোরী মিত্তির মাথা নাড়ল, না, না,—দোষের কথা যদি বলো আমি তাহলে বলব, আমি চাঁদের কলঙ্ক নয়, একেবারে কলঙ্কের চাঁদ!

দুজনেই খানিকটা হাসল।

হঠাৎ কি মনে করে রবি বলল,—আমি কিন্তু একটা অন্যায় করেছি আপনার কাছে! আমি আনন্দ সরকারের ডায়েরীটা পড়েছি।

প্রথমে একটু চম্‌কে উঠলেও পর মুহূর্তেই সহজ হ'ল কিশোরী মিত্তির।—ভালো হ'ল। আমার অদ্ভুত জীবনটার খানিকটা কথাও কেউ জানতে পারল!

—আচ্ছা আনন্দ সরকারের সঙ্গে আপনার আর যোগাযোগ হয় নি?

—না! কিন্তু তার জন্যে আমি ভাবি না রবি। আনন্দ যদি বেঁচে থাকে, সে যেখানেই থাক সেখানে আর একটা মাঝিনডিহি তৈরী করে ফেলবে। কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের বেঁচে থাকা মানেই হ'ল পৃথিবীর ভালো হওয়া। আনন্দও তাই।

একটু থেমে দম নিয়ে কিশোরী মিত্তির বলল, আর, তুমি কী বলো? সুজাতাও কি তাই নয়? মানুষের দুর্বলতা থাকে। পতন হয়। তুমি কি সুজাতার সেইটুকুই মনে রাখবে? আমি তো হাওড়ার বাড়িতে সুজাতাকে ফেলে রেখে আবার পালিয়েছিলাম। সুজাতা কিন্তু নিজেকে ফেলে আর পালায় নি।

—আপনি কবে মাঝিনডিহিতে গিয়েছিলেন? আপনাকে ওখানকার মানুষজন চিনতে পারে নি?

কিশোরী মিত্তির মাথা নাড়ল।—মাঝিনডিহি কেউ যায়? আমি ভীতু, কাপুরুষ। মিছার সঙ্গে আমার কলকাতাতেই দেখা হয়েছিল। ফাদার প্যাট্রিকের ট্রাস্টের টাকাকড়ির ব্যাপারে ও কলকাতায় এসেছিল। অদ্ভুত দেখতে হয়ে গিছল মিছা। খসখসে চামড়া। শাদা চুল। চোখে চশমা। কেমন অন্যরকম। পাথর পাথর। মিছা আমায় ডায়েরীটা দিয়েছিল আর বলেছিল মাঝিন-ডিহি অনেক বদলে গেছে। বলেছিল, সুজাতা কিংবা আমি যদি

যেতে চাই, যেতে পারি। মাঝিনডিহিতে এখন অনেক কাজ। মিছার কাজ করার লোক আছে। কিন্তু আরও মানুষ দরকার। ওখানে গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে এখন কাজের মরশুম লেগে গেছে!

রবি কিশোরী মিস্ত্রিরের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। চুপ করে শুয়ে শুয়ে কিশোরী মিস্ত্রির যেন অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। কিশোরী মিস্ত্রির মৃদু হাসলে তার ঠোঁটের কোণটা অদ্ভুত বেঁকে যায়। ঠিক মন্দিরের গর্বোদ্ধত মূর্তির মত লাগে।

আর একটু দম নিয়ে আবার বলল কিশোরী মিস্ত্রির,—কেমন সব মানুষ এরা! না রবি? তোমাকে যদি এদের সকলের কথা বলতে পারতাম। জীবনে কত অদ্ভুত অদ্ভুত সব মানুষ দেখেছি। কারো সঙ্গে তাদের মিল নেই। কেমন অন্যরকমের। ছাঁচ থেকে ঝপাঝপ তৈরী করা নয় একেবারে হাত দিয়ে বানানো।

কথাটা বলেই হেসে উঠল কিশোরী মিস্ত্রির,—কার আবার হাত দিয়ে বানানো? দেখেছো, দেখেছো রবি। আমি কেমন মরণ-কালে হরিনাম করছি! কার আবার হাত দিয়ে বানানো হবে। আমি তো ভগবান-টগবান বিশ্বাসই করি না। অথচ···হোঃ হোঃ করে হেসে উঠতে গিয়ে আচমকা ব্যথায় ককিয়ে উঠল কিশোরী মিস্ত্রির। রবি দেখল কিশোরী মিস্ত্রিরের চোখ আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসছে। তার চোখ নিভে এলো। তারপর বিছানায় আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ল লোকটা।

রবি পাগলের মত ছুটে ডাক্তার ডাকতে গেল।

১০

সত্যিই মানুষটা রাজার মত চলে যাচ্ছে। সত্যিই রাজার মত। ফুলের মালা, চন্দনের টিকা, শাদা ধুতি পাঞ্জাবি। কালো গাড়িতে শোয়ানো হ'ল কিশোরী মিত্তিরকে। পিছনের ট্যাক্সিতে ওদের ছোট্ট ভিড়। আলো, সুজাতাদি আর এজমালি বাড়ির কয়েকজন। রবি আলাদা যাচ্ছিল। ওর সঙ্গে ছোট ভাই চন্দ্র।

শ্মশানের এককোণে চুপচাপ বসেছিল রবি। আগুনের শিখা কাঁপছে ঘেরা দেয়ালের গায়ে। মাংস পোড়ার গন্ধ। দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা কত মানুষের নাম। তাদের ফাঁড়ার কথা। মানুষের ফাঁড়ার কথা মানুষে পড়লে নাকি সেই ফাঁড়া কেটে যায়।

চন্দ্রও রবির পাশে চুপচাপ বসেছিল। শ্মশানে বোধহয় এই প্রথম এলো সে।

এইখানে বসে ডালাউসি স্কোয়ার, বড়বাজার, সিনেমা, ফুটবল খেলা, ছোটমাসির বাড়ির ওয়াক্স পালিশ আসবাবের কথা ভাবতেও এক ধরনের একটা কষ্ট হয়।

চন্দ্রকে অন্যমনস্ক করবার জন্যে রবি বলল, তুই হঠাৎ খবর পেলি কি করে?

—মা সুজাতাদির বাড়ি পাঠিয়েছিল আমাকে, তোমাকেই ডেকে নিয়ে যেতে।

—হঠাৎ, কেন রে?

—মা বলছিল তুমি আত্মীয় হয়ে আত্মীয়ের সর্বনাশ করেছ। ওরা আমাদের কত উপকার করেছে, আর তুমি নাকি ওদের···

রবি চাপা গলায় বলল,—আর বাবা? বাবা কি বলছিল?

—বাবা কিছু বলে নি। বাবা সব শুনে চুপ করে বসেছিল। একটু চুপ করে থেমে থেকে চন্দ্র আবার বলল,

—আমরা ভেবেছিলাম তুমি চাকরি পেলে আমাদের সঙ্গে এসে থাকবে দাদা। আমি আর লতু বলাবলি করছিলাম।

—ছোটমাসিরা এখন কোথায় রে?

—ওই বাড়িতেই। মা বলছিল তুমিই নাকি ওদের খুব বিপদে ফেলে দিয়েছ। এখন পুলিশ কেস হবে। তবে মা বলছিল ওদের টাকা আছে। অনেক টাকা মামার কাছেও রাখা আছে। ওদের গায়ে কোনো আঁচ লাগবে না।

—রবি চাপা গলায় বলল, তোর সঙ্গে ছোটমাসির দেখা হয়েছিল?

—নাঃ। কেন?

—নাঃ জেনে নিতাম ছোটমাসি এখনো সেই রকম সব সময় ভয় পায় কিনা? একটা বিচ্ছিরি ভয় পাওয়ার অসুখ হয়েছিল কিনা ছোটমাসির! আগুনের শিখা জ্বলছিল লক্‌লক্‌ করে। আগুনের ওপাশে সুজাতাদি আর আলো বসে। রবিকেই শেষ কাজগুলো করতে হবে। রবি উঠে দাঁড়াল। বলল,—চন্দ্র বাড়ি যা এবার। মাকে বলিস আমি এক সময় গিয়ে দেখা করব!

চন্দ্র উঠে দাঁড়াল। শ্মশানের এই আবহাওয়ায় সে সিঁটিয়ে শুকিয়ে গেছে। শুধু সাগ্রহে সে বলল, দাদা, এবার তুমি বাড়িতে থাকবে না?

—নারে! এখন না—বুঝিস তো। একটা চাকরি-বাকরি পাই! চন্দ্র উঠে দাঁড়াল। তার শীর্ণ আবছা পিঠটার দিকে তাকিয়ে রবি সন্তর্পণে বলল,

—আর তো ফিরে যাওয়া যায় না! বাদামতলা লেনে সে কোনো দিন, কোনো দিন আর ফিরে যাবে না।

চন্দ্র চলে যাবার পর রবি চিতার আগুনের পাশ দিয়ে সুজাতাদি

আর আলোর কাছে এলো। সুজাতাদি চুপচাপ বসে আছে। আলো এত কেঁদেছে যে ঝিমিয়ে পড়েছে। আর কাঁদতে পারছে না। রবি পাশে বসতেই সুজাতাদি আগুনের দিকে চেয়ে অল্প একটু হাসল। —দেখলি রবি শেষ পর্যন্তও ও ঠিক ওর মতই রয়ে গেল। আলোর কাছ থেকে পালাল।

আগুনের লক্লকে হল্কাগুলো ওপরের ফ্যাকাশে ধোঁয়া ওঠা অন্ধকারের বুক চাটছিল। হল্কাগুলো কি সুন্দর! হয়ত সুন্দর একটি পুরুষকে পুড়িয়ে উঠছে বলে আরো বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। রবি সুজাতাদির পাশে চুপচাপ বসে রইল।

রবির সামনে ঠক্ করে এককাপ চা বসিয়ে দিয়ে আলো বলল, —তাহলে তোমরা শেষ পর্যন্ত আমাকে নিয়ে কি করবে তা ঠিক করে উঠতে পারলে না?

রবি আলোর দিকে তাকালো। আলো এই বাড়ির মধ্যে ঘোরাফেরা করতে করতে একেবারে অশৈরণ হয়ে উঠেছে। এতদিন যে আলোকে রবি দেখেছে এ সেই আলো নয়। অন্যরকম। সব সময় অভিমান, দাবী। খামখেয়ালী। সুজাতাদি মাঝে মাঝে বলে, এমন করে আলোটা, যেন ওর মায়ের কোলের ওপর বসে আছে।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বিস্বাদ সুরে রবি বলল,

—কেন? আমরা তো তোমার বিয়ে দিয়ে দেব!

—বিয়ে ছাড়া তোমরা আর কিচ্ছু ভাবতেই পারো না একটা মেয়ের সম্বন্ধে। আশ্চর্য!

রবি বলল, আঃ, আমায় কেন? তোমার যা বলার তা সুজাতাদিকে গিয়েই বলো না। আমি তোমার সম্বন্ধে কি ঠিক্ করব। আমার নিজের সম্বন্ধেই কিছু ঠিক করে উঠতে পারলাম না!

কাপটা ঠক্ করে নামিয়ে দিয়ে রবি ঘরে চলে গেল। রবি এখন কিশোরী মিস্ত্রিরের ঘরেই আস্তানা গেড়েছে।

বিছানায় টান্‌টান্ হয়ে শুয়ে রবি চোখে হাত চাপা দিল। কিন্তু কান তো চাপা দেওয়া যায় না। শুনতে পাচ্ছিল আলো সুজাতাদির ঘরে গিয়ে বলছে, ফুলমাসি তোমরা কি আমায় তাড়িয়ে না দিয়ে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছো না। কেন, কেন ফুলমাসি আমি তো পড়াশুনো করছিলাম। আমায় একটা সুযোগ দাও না। আমাকে পড়াও না। তোমার পায়ে পড়ি ফুলমাসি,—ফুলমাসি।

রবি শুনছিল আলোর কণ্ঠস্বর কান্নায় দুঃখে ভেঙে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু রবির কি হবে? রবি কার পায়ে পড়তে যাবে?

বেশ ছিল রবি নতুন কলোনীতে। এতদিনে আরো বেশ থাকত। একটা চমৎকার ছিম্‌ছাম্ বাড়ি। চমৎকার চাকরি। ছোটমাসি ছোটমেসোর সুন্দর আন্তরিক ব্যবহার!

বিছানায় শুয়ে রবি এখন কাজ নেই কর্ম নেই এপাশ ওপাশ করছে। একটা চব্বিশ বছরের বেকার ছেলের এইভাবে বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে থাকা যে কি দুঃসহ একটা ব্যাপার কি বিরক্তি-কর সে কে বুঝবে। রবি আরো বিরক্ত হয়ে উঠছে এ জীবনটায় পূর্বের কতকগুলো শারীরিক মানসিক অভ্যাস হয়ে যাওয়ার জন্যে। নতুন কলোনীর সেই ভোরে বেড়ানো, চমৎকার খাওয়া, গায়ে ঘাম দিলেই হুহু শব্দে ফ্যান চালিয়ে দেওয়া। স্নান করতে ইচ্ছে হলেই প্রচুর জল ঢেলে স্নান। কত আরাম!

কিন্তু ভয়? আতঙ্ক? ছোটমেসোর সেই অদ্ভুত মুখোশের মত মুখ, ছোটমাসির বুকে হাত রেখে হাঁপাতে থাকা। রবি উঠে বসল। হঠাৎ তার মনে পড়ল একটা কথা। একবার পনেরই আগস্ট ফ্ল্যাগ্ হয়েস্টিঙ্-এর সময় তারা কথা বলেছিল বলে বাংলার স্যার অশনি-বাবু তাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। তাতেও তারা হাসাহাসি করেছিল। কারণ সেটাই তখন বাহাদুরী। বাড়ি ফেরার রাস্তায় অশনিবাবু রবি আর অলককে ধরেছিলেন। 'আয় তোদের আজ খুব বকেছি,

চল্ একটু মিষ্টি খাওয়াই।' পাড়ার শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ঢুকেছিল রবি আর অলক। মাস্টারমশাই-এর সামনা-সামনি বসেও গা টেপা-টেপি করছিল ওরা। ভিতর থেকে তখনো গুরগুর করে হাসি আসছে।

কিন্তু অশনিবাবুর মুখটা কেমন যেন আবেগে থমথম করছিল।

তোদের একটা কথা বলি, আমার তো এখন প্রায় ধর পঞ্চাশ বছর বয়স হ'ল! তোদের সবে তেরোচোদ্দ, তোদের হয়ত অদ্ভুত লাগবে। তোরা ঠিক বুঝবি না। তবু,…হেসেছিলেন অশনিবাবু। কেন যে কথাগুলো বলছিই বা তোদের। আমি নিজেই জানি না। …জানিস যেদিন আমাদের এই ভারতবর্ষ স্বাধীন হ'ল,—তখন মাঝ রাত্তির। আমি তখন সবে ইস্কুলে চাকরি পেয়েছি। ছটফট্ করছিলাম। কিছুতেই ঘুমোতে পারছিলাম না। আমার দাদু ছিলেন সেই পুরোনো দিনের বিপ্লবী। তিনি জেগে বিছানায় বসে ছিলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম।…তোরা বুঝবি না, পরাধীন দেশে তো তোদের জন্ম নয়। সব সময় আমাদের ওপর একটা অপমান একটা দুঃখ কেমন চেপে বসে থাকত। ছোটবেলা থেকেই বাবা দাদুর মুখে শুনে শুনে পাগল পাগল লাগত। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতাম, মনে হত এই রাস্তা পরাধীন। গঙ্গার পাড়ে ফুটবল খেলতে যেতাম—হাতে করে মাটি তুলে নিতাম, ভাবতাম এই মাটি…পরাধীন…

দেশ স্বাধীন হবার আগে, আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন। আমার বাবা ছিলেন আগস্ট আন্দোলনের একজন কর্মী। মারা যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বাবা খালি বলতেন আমি স্বাধীন ভারত-বর্ষ দেখে যেতে পারলাম না। স্বাধীন ভারতবর্ষে মরতে পারলাম না। আমার দাদুও ওই এক কথা বলতেন। কিন্তু দাদু দেখে যেতে পেরেছিলেন। আমার দাদু তখন আশি বছরের বুড়ো। দাদু ছিলেন পুরোনো দিনের বিপ্লবী।

মনে আছে মাঝরাত! বাড়িতে বাড়িতে সবাই জেগে আছে। গম্‌গম্ করছে রেডিও,…দেশ স্বাধীন হচ্ছে, আকাশে বাতাসে বেজে উঠছে জাতীয় সংগীত। বাতাসে দুলছে পতাকার মালা। তুমুল শাঁখের আওয়াজ। মানুষজন ছুটে নেমে পড়েছে রাস্তায়। দাদু বিছানায় বালিশে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। পাগলের মত তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন,—আমি দেখতে পেলাম, দেখতে পেয়েছি! আমার কি ভাগ্য…কি পুণ্য…দাদুর দুচোখে জলের ধারা…বাবা মারা যাবার পরও দাদুকে আমি কখনো কাঁদতে দেখি নি। খুব শক্ত মানুষ ছিলেন দাদু।

মনে আছে আকাশ দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছিল, তখন ক্রমশ ভোর হয়ে আসছে। আমি দাদুকে ধরে ধরে নিয়ে এসে বারান্দায় বসিয়ে দিয়েছিলাম। দাদু বললেন,—ওরা সব আজ এই এত দিনে মুক্তি পেল। ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, প্রফুল্ল, বিনয়, বাদল, দীনেশ…ওরা সব…সব…

রবি আর অলক মিষ্টি খেতে খেতে শুনছিল। আর তখনো মাস্টারমশাই-এর অলক্ষ্যে গা টেপাটেপি করছিল। যতসব সেন্টি-মেণ্টাল ব্যাপার। দেশ স্বাধীন হ'ল। দেশের মাটি স্বাধীন হ'ল। তা বেশ হ'ল। তাতে কি হাতি ঘোড়াটা হ'ল? কারো সাতটা করে হাত পা গজাল কী? স্যারকে একবার জিজ্ঞেস করলে হয়, স্যার চালের দামটা একবার দেখেছেন স্যার? কিংবা আপনার তো এবার প্রমোশন হবার কথা ছিল স্যার, আপনার না হয়ে মানিকস্যারের হ'ল কেন? আমরা শুনেছি সেদিন আপনি দুর্নীতি নিয়ে কাঁদুনি গাইছিলেন!

কিন্তু এসব কথা সেই মুহূর্তে স্যারকে বলা যায় না। স্যারের মুখ এখন নিজের ছোটবেলার ব্যক্তিগত স্মৃতিতে থম্‌থম্ করছে। ছেলে-মানুষ হলে কি হবে। রবি জানত ব্যক্তিগত স্মৃতি বড় পবিত্র। বাইরে বেরিয়ে অশনিবাবু বলেছিলেন,—ছাখ, তবু বলছি, কতক-

গুলো বার তিথি আছে! কতকগুলো প্রতীক আছে, যেগুলো আমাদের বেসিক জিনিস। সেগুলোর অসম্মান করিস না। যে করে করুক তোরা অন্তত করিস না। আমার বড় লাগে।

কি জানি কেন, রবি আর অলক কোনোদিনই অশনিস্যারের কথা অমান্য করে নি।

হঠাৎ আজ বহুদিন পরে অশনিবাবুর ওই কথাগুলো কেন রবির মনে এলো কে জানে? মন বড় অদ্ভুত একটা ব্যাপার।

হুম্ হুম্ করে আলো ঘরে এলো।

রবি হেসে তাকাতেই সে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, তোমার চিঠি! তার বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে চিঠিটা নিতে নিতে রবি হাসল।

—লেখাপড়া করতে চাইছ?

—হ্যাঁ চাইছি!

—তাহলে আমাদের বিয়ের কি হবে?

—বিয়ে?

—বাঃ সেই যে তুমি সেদিন আমাকে তোমায় বিয়ে করার জন্যে খোসামোদ করছিলে! মনে নেই?

আলো মুখ লাল করে বলল, ভালো হবে না কিন্তু। সে অন্য ব্যাপার ছিল। সে কথা তুলবে না আর!

রবি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

আলোও এবার মজা পেয়েছে। ফিরে যেতে যেতে দরজায় দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, চাকরি করো, বাড়ি করো, তারপর তো বিয়ে। আর আমিও ইতিমধ্যে তোমাকে দেবার মত পণের টাকা জোগাড় করি…

রবি হেসে চিঠিটায় চোখ নামালো।

দিবানাথবাবু লিখেছেন,—

স্নেহের রবি,

একদিন দেখা করো। আমি সদা সর্বদা তোমার কথা

ভাবি। একদিন কোনো কারণে বলেছিলে, আর একবার একটি পাপ করতে পারেন। সেদিন বলেছিলাম পারি না। আজ মনে হয় তোমার মুখ চেয়ে তাও পারি। তোমার জন্য সত্যই কিছু করতে ইচ্ছা যায়। একদিন এসো। আশীর্বাদক

দিবানাথ দত্ত।

চিঠিটা হাতে নিয়ে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ চেপে শুয়ে পড়ল রবি। এভাবে শুয়ে থাকলে সে অনেক কিছু দেখতে পায়। স্বচ্ছ। ছবির মত। তারপর উঠে বসে চেঁচিয়ে ডাকল সুজাতাকে,—সুজাতাদি, সুজাতা-দি-ই···

কুটনো কোটা ফেলে উঠে এলো সুজাতা দি।—কিরে, কি বলছিস ?

রবি বলল,—সুজাতাদি তোমার মাঝিনডিহির কথা মনে পড়ে ? সেখানে যেতে ইচ্ছে করে না ?

সুজাতাদি রবির মুখের দিকে তাকালো। তারপর চোখ নামিয়ে নিল।

রবি বুঝতে পারল সুজাতাদি মনের মধ্যে ঠিক বলছে,—যাওয়া যায় না, আর ফিরে যাওয়া যায় না···

সুজাতাদির পিছন পিছন আলো এসে দাঁড়িয়েছিল। রবি বলল,—আজ ডিউটি থেকে ফিরে এসে তুমি আমায় মাঝিনডিহির কথা বলবে সুজাতাদি। আমাকে আর আলোকে···

সুজাতাদি রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,—বলব।

বিছানা থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙলো রবি। তার ইচ্ছে হ'ল আলোকে বলে,—বিছানাটা গুটিয়ে রাখবে। কক্ষনো পাতবে না।

তারপর হঠাৎ পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে আলোকে ডেকে বলল, এসো এদিকে এসো, একটা হেড্ টেল্ করা যাক্···

আলো বলল, কিসের হেড্ টেল ?

ধরো তোমায় বিয়ে করার, হেড্ উঠলে বিয়ে, টেল্ উঠলে নট, কি বলো ?

আলো বলল, ফুলমাসিকে এক্ষুনি বলছি গিয়ে দাঁড়াও··· আলো চলে যেতে রবি কিন্তু সত্যিই হেড্টেল করল। আধুলিটা হেড হয়েই পড়ল।

১১

দিবানাথবাবু আর রবি মুখোমুখি বসেছিল অনেকক্ষণ। সেই সেই অদ্ভুত জাদুকরী সন্ধ্যে! কেবল এই মুহূর্তেই একটা অদ্ভুত হাওয়া উঠছে ঈশান কোণ থেকে। তালগোল পাকিয়ে কালো একটা মেঘ এসে আকাশটাকে ঢেকে দিচ্ছে। একটা ভয়ংকর চাপা গুরগুর ধ্বনি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেলে যাওয়া।

দিবানাথবাবু চন্দ্রকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছেন। রবি তাতে রাজি। সে বেঁচে গেল।

দিবানাথবাবুকে রবি পাপ করতে দেয় নি। অর্থাৎ তিনি তেমন ভাবে নল চালাচালি করলে, তাঁর এবং তাঁর ছেলেদের যে কনেক্সন তাতে রবির একটা চাকরি হয়ে যেত হয়ত। কিন্তু রবি তাঁকে সে পাপ করতে দেয় নি।

দিবানাথবাবু পড়াশুনো শেষ না হওয়া পর্যন্ত চন্দ্রকে কাছে রাখতে চেয়েছেন। তাতেই রবি বেঁচে গেছে, আর তার কিছু চাই না।

মা বাবা আর লতু,···এখনো বাবার পেনসন আছে। মায়ের মহিলা আশ্রম! যতদিন চলে চলুক। কত মানুষেরই তো এভাবে চলে যাচ্ছে!

নিজেকে চারিদিক থেকে কেমন চমৎকার উপ্‌ড়ে উপ্‌ড়ে নিচ্ছে রবি।

নাকি সে একাই শিকড় ছিঁড়ছে না, অনেকে তার কাজে হাত লাগিয়েছে। অনেক পতিত, পাপী, বিপথগামী অর্থহীন মানুষের ভিতরের অনুতাপ!

কালো মেঘ ক্রমশ ফুলে ফুলে উঠছে। তার কোল ঘেঁষে উড়ে

গেল একসার ঝড়ে আতঙ্কিত বক। শাদা বিদ্যুতের মত। টপ্ করে বড় ফোঁটা পড়ল একটা। দিবানাথবাবু উঠে পড়লেন।

রবি বসেই রইল।

—তুমি যাবে না রবি! বৃষ্টি আসছে।

—আসুক! আমি এখানকার আর একজনের সঙ্গে দেখা করে যাব!

—আচ্ছা! লাঠিটা তুলে নিলেন তিনি, বললেন—কাল আমি তোমার বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করব।

রবি হঠাৎ বেঞ্চ থেকে নেমে ঘাসের ওপর এসে বসল। প্রবল বেগে হাওয়া দিয়েছে। রবির চুলে এসে বিঁধছে উড়ন্ত শুকনো পাতার কুচি। ধুলো ঝড়ের মধ্যেও চোখ তুলে তাকাল সে। এক পলকেই দেখতে পেল দিবানাথবাবুর দীর্ঘ মূর্তিটা ক্রমশ ছোট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর তার পাশ দিয়ে ক্রমশ বড় হয়ে এগিয়ে আসছে মধুরার ছবিটি। উড়ন্ত পালের মত ফুটে উঠছে তার আঁচল। একহাতে সামলাতে হচ্ছে শাড়ির কোঁচা।

রবি খানিকটা ঘাস মেশানো মাটি অনর্থক হাতে তুলে নিল। হঠাৎ তার মনে হ'ল স্বাধীন দেশের মাটি!

মধুরা সামনে এগিয়ে আসতেই সে বলল,—আচ্ছা, আমরা কেউ আর এভাবে মাটির কথা ভাবি?

—কি ভাবে?

—এই যে, স্বাধীন দেশের মাটি!

মধুরা মাথা নেড়ে বলল, আমি কখনো ভাবি নি!

—আমাদের বয়সের কেউ ভাবে না!

মধুরা বলল, আপনাকে অনেকদিন দেখি না। আপনি কি ওঁদের ওখান থেকে চলে গেছেন?

—হ্যাঁ!

—সবাই বলছিল আপনাকে খুঁজতে পুলিশ এসেছিল!

রবি হাসল,—নাঃ, আমাকে খুঁজতে নয়।

বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এলো। বিকেলের রঙ একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে। পার্কে কেউ নেই। ঝড় উঠতেই উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেছে সব।

মধুরা আর রবিও উঠে পড়ল। ছুটতে ছুটতে গিয়ে একটা বিশ্রাম ঘরে গিয়ে দাঁড়াল দুজনে। চারিদিক মেলা। মাইল মাইল ঝড় ভেঙে পড়ছে বৃষ্টির সঙ্গে। ছাঁটে ভিজে যাচ্ছে সব। কৃষ্ণচূড়ার ফুল ও ভাঙা ডাল পর্যন্ত ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে আসছে এত দূর পর্যন্ত। মাথার ওপরের ছাউনি ছাদটাও বিশেষ কাজ করছে না।

মধুরা বলল, আপনি আজ হঠাৎ পার্কে এলেন যে,—

—আমার অন্য কাজ ছিল এ পাড়ায়। তাছাড়া আপনার সঙ্গেও খুব দরকার ছিল।

রবির পাঞ্জাবি পাজামা খুব ভিজে গেছে। তবু প্রাণপণে চেষ্টা করছিল সে কাঁধে ঝোলানো ঝোলাটাকে শুক্‌নো রাখতে।

মধুরা হাসছিল, কোথায় এসে দাঁড়ালাম বলুন তো, একেবারে ভিজে গেলাম।

—মাঠ পেরিয়ে ছুট দিন না? আপনাদের বৈজয়ন্তী আবাস এখান থেকে বেশিদূর নয় মাইল দেড়েক তো মাত্র!

—ঠাট্টা করবেন না!

মধুরা সরতে সরতে একটা কোণ বেছে নিল!

দুজনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখ্‌ছে! ঝড়ের বেগে বিশাল পার্ক জুড়ে বৃষ্টি দুলছে। মধুরা বলল,—আপনাকে একটা কথা বলবার আছে, মাস্টারমশাইকে ওঁর বাড়ি থেকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে গেছে।

মধুরার মুখের একটি পাশ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছিল। তার চুলে ছোট একটি পাতা আটকে আছে। কয়েকটি চুল জলে ভিজে, কালো জরির মত তার কপালে পড়েছিল। ভুরুর ওপরে বিন্দু বিন্দু জল।

—আপনার মাস্টারমশাই কেমন আছেন ?

—মাস্টারমশাইকে ওঁর দিদির কাছে পাঠানো হয়েছে। ওঁর দিদি জামাইবাবু ভূপালে থাকেন। ওখান থেকে উনি অনেক জায়গায় ঘুরবেন। তাতেও যদি কিছু না হয় তাহলে ওরা নাকি মাস্টারমশাইকে কোনো মেণ্টাল হাসপাতালে দেবেন !

—আর আপনি কি ঠিক করেছেন ?

—আমি ? মধুরা ঢোক গিলল,—আমি ঠিক করেছি মাস্টার-মশাইএর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তিনি তো মুখ ফুটে আমাকে কোনোদিন কিছু বলেন নি। কিন্তু আমার জন্য যদি এত কষ্ট পান তাহলে আমাকে তাঁর কাছে চলে যেতেই হবে। বলুন তাই না ? অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রবি বলল,—ঠিক তাই !

মধুরা আর রবি খুব কাছাকাছি, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল। ঝড় শান্ত হয়ে গেছে। এখন অঝোরে বৃষ্টি। পার্কের ঠিক মাঝখানে এই চারিদিক খোলা ছোট্ট ঘরটি। পার্কের পরেও অনেকটা খোলা-মেলা প্লট্। রাস্তা। দূরে দূরে নতুন কলোনীর দু-একটা আলোর বিন্দু দেখা যায়। বাকি সব বৃষ্টিতে অন্ধকারে ভেসে চলে গেছে।

অনেক সময় রবি মনে মনে মধুরার সঙ্গে কথা বলে। আজ ইচ্ছে করছিল কথাগুলো মধুরার কাছে পৌঁছে দেয়। কিছু এমন কথা নয়। তার নিজের কথা। ছোটোখাটো সব ব্যাপার, ঘটনা, স্মৃতি, দুর্বলতা। তার দেখা মানুষদের কথা। তার চিন্তা-ভাবনা নেশা এই সব কিছুর কথা। কিংবা কিছুই না। সেই ভোরের, অনেক উঁচু দিয়ে যাওয়া উড়ন্ত পাখিদের কথা !

কিন্তু রবি কিছুই বলতে পারল না। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল তারা সত্যি সত্যিই খুব কাছাকাছি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে !

বৃষ্টি থামলে দুজনে অন্ধকারের মধ্যে হেঁটে হেঁটে গেটের দিকে এগোল। রবি টের পেল গাছপালা, ফুলপাতা, মাটি খোয়া সব

কিছু থেকেই একটা ভিজে গন্ধ উঠছে। এমনকি তার আর মধুরার শরীর থেকেও। যাকিছু জীবনে প্রথম, তা মানুষ এভাবেই বোধহয় হাড়ের ভিতরে মজ্জা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বোধ করে। বোধহয় সেই জন্যেই রবি কোনোদিন এই সন্ধ্যাটির কথা ভুলতে পারবে না।

নতুন কলোনীর রাস্তার মুখের কাছে মধুরাকে পৌঁছে দিয়ে রবি বলল, আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম !

—এতক্ষণ তো বলেন নি কিছু !

—বিশেষ কিছু না ! আজ সকালে একটা হেড্‌টেল করেছিলাম, লট্যারি আর কি।

—কিসের ?

—আপনাকে একটা ডায়েরী পড়তে দেব কি দেব না ?

—আপনার ডায়েরী ?

রবি দেখালো মধুরার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে আসছে !

—না, আমার নয়। আনন্দ সরকার বলে একজন মানুষের !

—কেন ? আমাকে হঠাৎ···

—যে পারে, তার কাছেই তো সকলে আসে। তাই না ? তবু বিশ্বাস করুন আমি চাইনি আপনার ওপর আমার একটা ভাবনার ভার চাপাই। কিন্তু আধুলিটা অন্যকথাই বলল যে,—

একটু হেসে রবি ঝোলা থেকে সেলোফেনে মোড়া আনন্দ সরকারের ডায়েরীটা বের করে মধুরাকে দিল।

—এটা পড়বেন। পড়ে যদি কাছে রাখতে ইচ্ছে হয় রাখবেন। না হলে ভিতরে ঠিকানা লিখে দিয়েছি। আলো বলে একটি মেয়ে আছে তার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

মধুরা ডায়েরীটা হাত পেতে নিল। রবি দেখল কিছু না জেনেও সে ডায়েরীটা বুকের কাছে ধরেছে।

রবি চলে যাচ্ছিল। মধুরা পেছন থেকে ডাকল,—

—আর যদি আপনাকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে।

—ওই ডায়েরীতে যে ঠিকানা আছে,—আনন্দ সরকারের, সেখানে লিখবেন।

কথাটা বলে রবি আর দাঁড়াল না। দ্রুত হাঁটতে লাগল।

মিছা মেঝেনের চিঠিটা রবির পকেটের মধ্যে এতক্ষণে ভিজে ভিজে বোধহয় আব্‌ছা হয়ে এলো। তা হোকগে। তার বুকের ভিতরে কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে সবুজ আলোর ঢল। সিগন্যাল ডাউন দিয়েছে। গুরগুর করে উঠছে চলন্ত ট্রেনের আওয়াজ।

মা, বাবা, চন্দ্র, লতু, সুজাতাদি, দিবানাথ, সুজাতাদির কুড়োনি মেয়ে, প্রণব, আর মধুরা।

এরা কতদূর তার সঙ্গে যাবে কে জানে?

ববি তো এদের কারো দিকে যাচ্ছে না। রবি যাচ্ছে আনন্দ সরকার, ফাদার প্যাট্রিক, আর মুন্নীর জগতের খুব কাছাকাছি।

পরশু সকালে সে মহকুমা শহরে গিয়ে নামবে। সেখান থেকে উঠ্‌বে বাসে। মেটাল্‌ড্‌ রোড ধরে বাস তাকে পৌঁছে দেবে মাঝিন-ডিহি যাওয়ার রাস্তার মুখে।

সেখানে তার জন্যে নিজে এসে অপেক্ষা করবে মিছা মেঝেন।

মিছা মেঝেন তাকে ছেলে সম্বোধন করে চিঠি লিখেছে।

রবি নিচু হয়ে মিছা মেঝেনের পা ছোঁবে।

তারপর তারা গরুর গাড়িতে রওনা হবে। অনেক দূরে গিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াবে সেই ফুলে ফুলে রূপসী হয়ে থাকা কুর্চি গাছটার তলায়। এসময়টায় ফুলে ফুলে শাদা হয়ে থাকে কুর্চিগাছ।

রবি আর মিছা মেঝেন, হাঁটু গেড়ে বসবে। নামহীন মাটির একটা উঁচুস্তূপের ওপর জারুল কাঠের একটা জীর্ণ ক্রুশ।

রবি মাথা তুলতেই…কি আশ্চর্য রবি এখনই স্পষ্ট দেখতে পেল, একটু বাঁকা হয়ে থাকা শুক্‌নো কাল্‌চে ক্রুশটার ওপাশে ঢেউ খেলানো লাল কাঁকুরে প্রান্তর রোদে ভাসছে! আর তার শেষ প্রান্তে আকাবাঁকা রাস্তা গিয়ে ছুঁয়েছে সবুজে সবুজ মাঝিনডিহি

গ্রামটাকে। মাঝে মাঝে লাল কৃষ্ণচূড়ার মশাল দপ্‌দপ্‌ করছে। রবি স্পষ্ট দেখলো গাছের ওপর দিকের সবুজ ডাল থেকে মাঝে মাঝে নীল আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি।

কোন পাখি? রবির কানে অস্পষ্ট পিস্টন আর হুইসল্‌-এর শব্দ ভেসে আসছে। সেই সব পাখি যারা শহর দেখলেই নেমে আসে না, জানলায় বসে না, গলির ময়লা খুঁটে খায় না। শুধু রোদ্দুরের দিকে, উঁচুর দিকে উড়ে যায়। মুন্নির ছেড়ে দেওয়া টিয়াটার মত সমস্ত পতনের বিরুদ্ধে।